



মালিকাতুল্লাহ

(মহান আল্লাহর ফেরেশতাবাহিনী)

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ



মালিকাতুল্লাহ

(মহান আল্লাহর ফেরেশতাবাহিনী)

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

মালাইকা তুল্লাহ্

(মহান আল্লাহর ফেরেশতাবাহিনী)

হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ সানী আল-মুসলেহ্ মওউদ (রা.)

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

মালাইকা তুল্লাহ্

(মহান আল্লাহর ফেরেশতাবাহিনী)

গ্রন্থস্বত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউকে
প্রকাশনায়	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ৪ বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মূল	হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী আল-মুসলেহ্ মওউদ (রা.)
ভাষান্তর	বাংলা ডেস্কের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনূদিত
প্রকাশকাল	জুন ২০২৪
সংখ্যা	২০০০ কপি
মুদ্রণে	ইন্টারকন এসোসিয়েটস্ ৪৫/এ, নিউ আরামবাগ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Malaikatullah
(The Angels of Allah)

মালাইকা তুল্লাহ্
(মহান আল্লাহর ফেরেশতাবাহিনী)

by
Hazrat Mirza Bashir Uddin Mahmud Ahmad
Khalifatul Messiah II and Musleh Maud^{ra}

1st Published in Bangladesh in June 2024

Translated into Bengali by
A team of Bangla Desk

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh

© Islam International Publications Ltd., UK

ISBN: 978-984-991-156-2

ভূমিকা

ঈমানের অঙ্গগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হলো ফেরেশতার প্রতি ঈমান আনা। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও ঈমানের অন্যান্য অঙ্গগুলোর বিষয়ে মানুষ যতটা জ্ঞান রাখে ততটা জ্ঞান ফেরেশতা সম্পর্কে রাখে না আর জানা কথা, যে বিষয়ে মানুষ যত বেশি জ্ঞান রাখে সে বিষয়ে তার ঈমান তত বেশি দৃঢ় হয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখে হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী আল-মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তের সদস্যদেরকে ফেরেশতার প্রকৃত বাস্তবতা অবগত করার লক্ষ্যে ১৯২০ সালের জলসা সালানায় একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ, সাবলীল এবং খুবই সহজবোধ্য একটি বক্তব্য প্রদান করেন। পরে এটি 'মালাইকাতুল্লাহ্' নামে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকে হযূর (রা.) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার কারণ, বিভিন্ন ধর্মে ফেরেশতা সম্পর্কে বিশ্বাস, ফেরেশতার পরিচয়, তাদের প্রকারভেদ, তাদের কাজ, তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং ফেরেশতাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ফেরেশতাদের বিষয়টি একটি জটিল বিষয় হলেও এ পুস্তক পাঠ করলে মানুষ ফেরেশতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিশদ জ্ঞান লাভ করে এবং এ সম্পর্কে তাদের ঈমান দৃঢ় হয়।

মরকযী বাংলা ডেকের তত্ত্বাবধানে পুস্তকটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। যারা এই অনুবাদকর্মের সাথে সম্পৃক্ত তাদের নামের তালিকা দোয়ার জন্য সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও যারা এই অনুবাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাদের সবাইকে আল্লাহ তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

পরিশেষে আশা করি, পুস্তকটির মাধ্যমে আহমদীদের পাশাপাশি বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষ ফেরেশতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিশদ জ্ঞান লাভ করতে পারবে এবং পুস্তকটি ঈমানের এই অপরিহার্য অঙ্গের প্রতি দৃঢ়ভাবে ঈমান আনতে সহায়ক হবে। আল্লাহ তা'লা আমাদের প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন, আমীন।

আব্দুল আজীজ পাঠ চৌ.

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

- ০১) মওলানা ফিরোজ আলম
- ০২) মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
- ০৩) মওলানা সাঈদ আহমদ
- ০৪) মওলানা বশীরুর রহমান
- ০৫) মওলানা আহমদ তারেক মুবাম্মের
- ০৬) মওলানা মোবারিজ আহমদ সানী
- ০৭) মওলানা মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম
- ০৮) মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান
- ০৯) মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান
- ১০) মওলানা মাহমুদ আহমদ সুমন
- ১১) মওলানা জহির আহমদ
- ১২) মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
- ১৩) মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
- ১৪) মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন
- ১৫) মওলানা আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী
- ১৬) মওলানা মামুন-উর-রশীদ
- ১৭) মওলানা নাভিদুর রহমান

লেখক পরিচিতি



প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলীফা হযরত আলহাজ্জ মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম এবং জীবন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর বহন করে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে এই প্রতিশ্রুত সন্তানের বায়ান্নটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছিল। তাঁর রচিত কুরআন শরীফের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংবলিত ‘তফসীরে সগীর’ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা সংবলিত ‘তফসীরে কবীর’ তাঁর অস্লান স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

তিনি ১৯৩৪ সালে ‘তাহরীকে জাদীদ’ স্কীম আরম্ভ করে সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়া মসজিদ ও ইসলাম প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখেন। তিনি এই জামা’তের কয়েকটি অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠা করে জামা’তকে সাংগঠনিকভাবে অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও সুসংহত করেন। তাঁর খেলাফতকালে এই ঐশী জামা’ত বিশ্বের ৭৫টি দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলীফা তাঁর ৫২ বছর দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও কল্যাণময় খেলাফতকাল অতিবাহিত করে ০৮ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের রাবওয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মালিকাতুল্লাহ

(মহান আল্লাহর ফেরেশতাবাহিনী)

হযরত ফযলে উমর খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর বক্তৃতা

[যেটি হুযূর (রা.) সালানা জলসা উপলক্ষ্যে ১৯২০ সনের ২৮ ডিসেম্বর নূর মসজিদে যোহরের নামাযের পর প্রদান করেছিলেন।]

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○ إِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○ (الفاتحة)

কথা স্মরণ রাখার উপায়

আমি বিগত জলসাপুলোতেও আপনাদের বার বার নসীহত করেছি এবং পরামর্শ দিয়েছি যে, যারা বিশেষভাবে কোনো কথা স্মরণ রাখতে চায় তাদের জন্য এর একটি উত্তম উপায় হলো, লিখতে থাকুন; কেননা মানুষের মাথার গঠন খোদা তা'লা এমন বানিয়েছেন যে, কোনোকিছু জানার জন্য যত বেশি ইন্দ্রিয় কাজে লাগানো হয় তা তত বেশি মনে থাকে। যা জানার জন্য একটি ইন্দ্রিয় কাজ করে, তার প্রভাব মস্তিষ্কের ওপর তার চেয়ে কম হবে যা উদ্ঘাটনের জন্য বা জানার জন্য দুটি ইন্দ্রিয় কাজ করে। যখন কোনো ব্যক্তি কথা শোনার পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করে তখন তার দুটি শক্তি কাজ করবে। অর্থাৎ তার দৃষ্টিও সে কথার ওপর পড়বে আর তার ইচ্ছাশক্তিও উদ্দীপ্ত থাকবে, তার মস্তিষ্কে বেশি গভীর প্রভাব পড়বে। অবশ্য সেই লেখা নয় যা সাংবাদিকরা লেখে, কেননা তাদের ওপর লেখার এত বেশি চাপ থাকে যে, তাদের জন্য স্মরণ রাখা সম্ভব নয়। তাদের যেহেতু অন্যদের জন্য লিখতে হয় তাই তারা প্রতিটি শব্দ সংরক্ষণের চেষ্টায় থাকে। কিন্তু অন্যরা যেহেতু সারকথা

লেখে তাই তারা এটি নিয়ে প্রণিধানের সুযোগ পায়। চিন্তা ও প্রণিধানের পর যখন তারা লেখে তখন সেই কথা তাদের স্মৃতি থেকে বাইরে যেতে পারে না। লেখার পাশাপাশি এর ওপর তাদের দৃষ্টি পড়তে থাকবে, আর এভাবে সেই কথা তাদের স্মৃতিতে আরো বেশি গেঁথে যেতে থাকবে। এ কারণেই আমাদের প্রবীণ বুজুর্গরা এই বিষয়ে সচেতন থাকতেন আর দরস দেবার সময় শ্রোতাদের খাতা কলম ছাড়া বসতে দিতেন না। লেখা রয়েছে যে, ইমাম মালেক (রহ.) দরস দিতেন, তাঁর দরসে ইমাম শাফী (রহ.) এসে বসেন। ইমাম মালেক (রহ.) মদীনায় বসবাস করতেন আর তিনি মক্কা থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর বয়সও কম ছিল, অর্থাৎ ১৩ বছর বয়স ছিল। দু-তিন দিন এভাবে তিনি তাঁর বৈঠকে বসার পর তিনি [অর্থাৎ ইমাম মালেক (রহ.)] যখন দেখলেন যে, তার কাছে খাতা-কলম ও দোয়াত নেই তখন ইমাম মালেক (রহ.) তাকে বলেন, হে বালক! তোমার এখানে বসার উদ্দেশ্য কী? দরসে আসে অথচ লেখে না— ইমাম মালেক (রহ.) এটি পছন্দ করেন নি। ইমাম শাফী (রহ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এমন স্মৃতিশক্তি দিয়েছিলেন যে, যা শুনতেন তা মুখস্থ হয়ে যেতো। তিনি বলেন, পড়ার জন্য এসেছি।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, তাহলে লেখ না কেন? তিনি বলেন, আমি যা শুনি মুখস্থ হয়ে যায়। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, তাহলে আমি যা পড়িয়েছি তা শুনাও। তিনি শুনিয়ে দেন। ইমাম মালেক (রহ.)-এর অন্যান্য শিষ্যরা বলেন যে, আমাদের খাতায় ভুল ধরা পড়ে, কিন্তু তিনি হুবহু শুনিয়ে দেন।

তবে প্রত্যেক ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি এমন হওয়া সম্ভব নয়। তাই এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত যার মাধ্যমে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে যে ঘাটতি থাকে তা যেন দূরীভূত হয়ে যায়। আর তা হলো, যা-কিছু শুনা হয় তা নিজের মতো করে নোট করে নেয়া। এর আরেকটি উপকারিতা হলো, মানুষ তা বার বার দেখে মুখস্থ করে নিতে পারে।

শোনার সময় পুরো মনোযোগ দেওয়া উচিত

এরপর আমি আপনাদের আরেকটি উপদেশ দিতে চাই, আর তা হলো, শোনার সময় বিষয়ের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত, কেননা জ্ঞানগর্ভ কথা বোঝা ও স্মরণ রাখা সহজ বিষয় নয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ শোনার পরও সেভাবেই খালি হাতে বেরিয়ে যায় যেভাবে আসে।

কুরআন করীমে এমন লোকদের সম্পর্কে কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; যেহেতু এটি একটি উপমা তাই তুলে ধরছি:

বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে মুনাফিকরা আসত আর বাইরে গিয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করত যে, ‘মা যা ক্বালা আনেফান’ (মুহাম্মদ: ১৭) অর্থাৎ, এখনই তিনি কী বলেছেন? তারা বৈঠকে আসত ঠিকই, কিন্তু কী বলা হতো তা শুনতো না তাই একে অন্যকে জিজ্ঞেস করত। আসল কথা হলো, মানুষ যখন এমন কোনো সভায় বসে যেখানে ধর্মের কথা হয় তখন শয়তান তার মনোযোগ মারাত্মকভাবে নষ্ট করে যেন মানুষ সেসব কথা থেকে উপকৃত হতে না পারে আর হোঁচট খায়।

অনেকেই এমন থাকে যারা বৈঠকে বসে, কিন্তু যে কথা শোনানো হয়, সেদিকে মনোযোগ দেয় না। কোনো কোনো সময় যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কী বলা হয়েছে? তখন তারা বলে, অনেক উপভোগ করেছি, কিন্তু মনে নেই যে, কী বলা হয়েছিল? এমন লোকদের উপভোগের কারণ এটি নয় যে, তারা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, বরং এজন্য উপভোগ করে যে, অন্যরা বাহবা দিচ্ছিল এবং স্বাদ পাচ্ছিল।

অতএব যা বলা হয় তা মনোযোগ দিয়ে শোনো ও প্রণিধান করো। আর আপনাদের মাঝে যাদের কাছে লেখার ব্যবস্থা আছে ও লিখতে অভ্যস্ত তারা লিখে নিন। অবশ্য যাদের লেখার অভ্যাস নেই তারা লিখবেন না, যেন এমনটি না হয় যে, লিখতে গিয়ে ভুলে যাবেন। যাদের লেখার অভ্যাস আছে তারা লিখুন। এটি আমি এজন্য বলছি যে, অনেক সময় অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে বক্তৃতাসমূহ দ্রুত ছাপা সম্ভব হয় না আর হৃদয়ে যে ছাপ সৃষ্টি হয় বা প্রভাব পড়ে তা মুছে যায়। কিন্তু যারা নিজেরা লিখবে তারা তাদের লেখা দেখে নিজেদের স্মৃতি সতেজ করতে পারবে।

গত বছর এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল যা ঈমানের মৌলিক বিষয়াদির অন্তর্গত, কিন্তু এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যে, উক্ত বক্তৃতা দ্রুত ছাপা সম্ভব হয় নি আর সম্প্রতি ছেপেছে। এখন এটি যে পড়বে তার কাছে নতুন বিষয় মনে হবে। কিন্তু যারা নোট লিখেছে তারা অনেক লাভবান হয়ে থাকবে।

বিষয়ের গুরুত্ব

আজকের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর ইসলামের মৌলিক নীতি ও ঈমানের স্তম্ভগুলোর একটি এবং অতি সূক্ষ্ম একটি বিষয়। তকদীরের বিষয়টি কঠিন ছিল, কিন্তু সেদিকে যেহেতু সব ধরনের লোকদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে তাই সেই মনোযোগ ও একাগ্রতার কারণে বিষয়টা বোঝা সহজ ছিল, কিন্তু এই বিষয়টি এমন যে, ঈমানের স্তম্ভগুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদিকে মানুষের মনোযোগ নেই।

‘তকদীর’ শব্দটি এতই প্রসিদ্ধ যে, যখনই কারো কোনো ক্ষতি বা লাভ হয় সে বলে দেয় যে, তকদীরের লিখন ছিল। সেই বক্তৃতায় যেহেতু বার বার ‘তকদীর’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাই সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকত। মানুষ যেহেতু সাধারণত জানতে চায়, তকদীর কী? তা এ কারণেও যে, এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা মনোযোগ-সহকারে শোনার আগ্রহ ছিল। অধিকন্তু তকদীর যেহেতু নিত্যদিন সামনে আসে এ কারণেও এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল।

কিন্তু আজকে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হবে, যদিও তা ঈমানের মৌলিক বিষয়াদির অন্তর্গত, কিন্তু বার বার মানুষের সামনে আসে না আর মানুষ জানেও না এবং বুঝেও না যে, এটিকে কেন ঈমানের মৌলিক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বিষয়টি হলো, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব (সংক্রান্ত)।

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে খোদা তা’লা ঈমানের মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যে ব্যক্তি ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনে না সে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কিতাবের প্রতি, রসুলের প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখলেও মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারে না, বরং সে কাফেরই থাকবে। মহানবী (সা.)-এর অস্বীকারকারী যেভাবে কাফের হবে, একইভাবে জিবরাইলে অবিশ্বাসী ব্যক্তিও কাফের হবে। যেভাবে খোদা তা’লার গ্রহাবলির অস্বীকারকারী কাফের, সেভাবেই ফেরেশতাদের প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তিও কাফের হবে। যেমনটি হাশর ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী ব্যক্তি কাফের, অনুরূপভাবে ফেরেশতাদের অস্বীকারকারী ব্যক্তিও কাফের হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলমানরা ফেরেশতাদের প্রতি খুব কমই মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। ফেরেশতাদের স্বরূপ কী, তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা কেন আবশ্যিক করা হয়েছে, এদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে কী লাভ হয়— এটি তাদের জানা নেই। মহানবী (সা.) বা কুরআন মজীদে প্রতি ঈমান আনার লাভ হলো, এতে ভালো কাজের প্রতি পথের দিশা লাভ হয় এবং সেগুলোর ওপর আমল করে মানুষ আধ্যাত্মিকতার উন্নত মার্গ অর্জন করতে পারে। কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনাতে লাভ হলো, মানুষ ভয়ের কারণে পাপ ছেড়ে দিয়ে পুণ্যকর্ম করে কেননা সে জানে, কিয়ামত দিবসে মন্দ কর্মের দরুণ শাস্তি পাবে আর

পুণ্যকর্ম সাধনের জন্য পুরস্কার লাভ করবে। খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করার কল্যাণও অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ তা'লা হলেন রাযেক তথা জীবনোপকরণ দাতা, তিনি সর্বশ্রষ্টা, পরম দয়ালু ও মহাসম্মানিত। তাঁকে মান্য করে তাঁর এসব ঐশী গুণ দ্বারা লাভবান হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ফেরেশতারা কারা বা ফেরেশতা কী- যাদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে? তাদের মান্য করার উপকারিতাই- বা কী?

ফেরেশতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস

সাধারণভাবে ফেরেশতাদের বিষয়ে মানুষের যে বিশ্বাস রয়েছে সে সম্পর্কে ভেবে দেখুন যে, তা যদি হারিয়ে যেতে থাকে তাহলে তাদের মাঝে কী ঘাটতি দেখা দিবে? প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তা করে দেখুক, আমি যদি মহানবী (সা.)-এর বিষয়ে বলি যে, তিনি রসূল নন তাহলে এর ফলে তাঁর আনিত শিক্ষা তার জীবন হতে হারিয়ে যেতে থাকবে। কুরআন সম্পর্কে যদি বলি যে, এটি আল্লাহ তা'লার বাণী নয় সেক্ষেত্রে এর শিক্ষাকে বাদ দিতে হবে। কিন্তু যদি বলি, ফেরেশতা বলতে কিছু নেই তাহলে কী ক্ষতি হবে?

মানুষ ফেরেশতাতে যে ঈমান লালন করে ৯৯ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে সেই ঈমানের পরিমাপ এতই নগণ্য যে, যদি একে বাদও দিয়ে দেওয়া হয় তবুও এতে তাদের বর্তমান ঈমানে কোনো ঘাটতি হবে না আর তাদেরকে মানার কারণে মানুষের ঈমানে কোনো বৃদ্ধিও ঘটবে না। অথচ ঈমানিয়াতের (অর্থাৎ যে-সব বিষয়ে ঈমান আনা আবশ্যিক) প্রতিটি বিষয়েরই অর্থ হলো, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উপকারিতাও অনেক। আবার একে পরিত্যাগ করার ক্ষতিও বিস্তর! এমন নয় যে, কেবল মৌখিকভাবে অমুক বিষয় মেনে নিলাম আর তা-ই যথেষ্ট, বাস্তবে তা মানলেও কোনো লাভ হয় না আর অস্বীকার করলেও কোনো ক্ষতি নেই! এভাবে তো আমরা হিমালয় পর্বতেও বিশ্বাস রাখি। কিন্তু যেহেতু হিমালয় পর্বতের অস্তিত্বে ঈমান আনলে কোনো উপকারও হয় না আর এটি অস্বীকার করলেও কোনো ক্ষতি নেই, তাই একে ঈমানের বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তবে ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমানিয়াতের (অর্থাৎ যে-সব বিষয়ে ঈমান আনা আবশ্যিক) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতএব তাদের প্রতি ঈমান রাখা আবশ্যিক যেন তা প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে এবং ঈমান না রাখা যেন ক্ষতির কারণ হয়।

ফেরেশতাদের ওপর ঈমান কেন আনব?

মোটকথা এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, ফেরেশতাদের অস্তিত্বে কেন বিশ্বাস রাখব? আমাদের সাথে তাদের কী সম্পর্ক রয়েছে? তাদের মাধ্যমে আমাদের কী লাভ হয়? তাদের মাধ্যমে আমাদের যদি কোনো লাভ না-ই হয় তাহলে তাদের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনই- বা কী? কেউ যদি বলে যে, মহানবী (সা.)-এর কাছে ফেরেশতার শিক্ষা নিয়ে এসেছে তাই তাদের প্রতি ঈমান রাখা উচিত, সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে- এতে তাদের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? তাদের মাধ্যমে ওহী প্রেরিত হওয়া সম্পর্কে আমরা যদি না জানি, তাহলে আমাদের ঈমান ও কর্মে কী ঘাটতি দেখা দিবে? যদি এটি ধরে নেওয়া হয় যে, আল্লাহ তা'লা সরাসরি মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে নিজ বাণী অবতীর্ণ করতেন তাহলে এতে কী বিপত্তি ঘটবে? এতে করে পবিত্র কুরআনে তো কোনো ঘাটতি দেখা দিবে না। তাহলে আমাদেরকে ফেরেশতাতে ঈমান আনতে কেন বাধ্য করা হয়? আর এত জোর দিয়ে কেন স্বীকার করানো হয় যে, তাদেরকে না মানলে মুসলমানই থাকা যায় না, কাফের হয়ে যেতে হয়!

এরূপ ধ্যানধারণার কারণে এ বিষয়টি কঠিনও বটে, বরং অনেকের জন্য হয়ত বিশ্বাসও হবে এবং তাদের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ থাকবে না, কারণ ফেরেশতাদের সত্তা এমন যা দেখা যায় না আর বাহ্যত তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। তকদীরের বিষয়টিও কঠিন ছিল। কিন্তু যখন সেটি সম্পর্কে বলা হতো যে, তকদীরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা কারো জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে রাখেন নি আর এমন নয় যে, মানুষ শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাবে না, তখন তকদীর সম্পর্কে প্রচলিত সেসব ধ্যানধারণার কারণে যেটিকে বোঝা মনে হতো তা দূর হয়ে যায়; এ কারণে তাদের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ থাকত এবং মানুষ মনোযোগ দিয়ে গুনত। তবে ফেরেশতাদের যেহেতু সম্পর্কহীন বিষয় বলে মনে করা হয় এবং তাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করা হয় না, তাই এ দিকে হয়ত মনোযোগ থাকবে না।

এ ছাড়া সাধারণ লেখকরাও ফেরেশতাদের সম্পর্কে কিছুই লেখেন নি। এদের বাস্তবতাকে তারা বুঝতেই পারেন নি। অথচ তাদের মাধ্যমে মানুষের এমনসব উপকার হতে পারে যা জানলে মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে এমনসব বই পড়বে যেগুলোতে তাদের উল্লেখ রয়েছে। সুফিরা তাদের বিষয়টি উঠিয়েছেন এবং নিজেদের রচনাবলিতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা যৎসামান্য। মহানবী (সা.)-এর পর যদি কোনো ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করে থাকেন তবে তিনি হলেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)। আর তিনিই (আ.) এসে তাদের অস্তিত্বের রহস্য

উন্মোচন করেছেন। মহানবী (সা.) ও মসীহ মওউদ (আ.)-এর মধ্যবর্তী সময়ে আর কেউ তা উন্মোচন করে নি। কুরআন করীম তাদের (মূল) বাস্তবতাকে উন্মোচন করেছে অথবা মহানবী (সা.)-এর উজ্জিতে তাদের উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য সুফিদের রচনাবলিতেও তাদের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু তা খুবই কম। অন্যান্য লেখকরা তাদের কথা উল্লেখই করে নি। ছোটো ছোটো বিষয়াদি সম্পর্কে তারা বহু গল্প বর্ণনা করেছে ঠিকই কিন্তু ফেরেশতা সম্পর্কে তারা এমন নীরবতা অবলম্বন করেছে যেন ফেরেশতারা কিছুই নয়। এর কারণ হলো, তাদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল এবং তাদের মাঝে বর্ণনা করার যোগ্যতা ছিল না। কিন্তু এখন যেহেতু এমন যুগ এসেছে যেখানে প্রতিটি বিষয়ের রহস্য উন্মোচন করা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন কেউ কোনো বিষয়কে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করার দুঃসাহস না দেখায়, তাই আল্লাহ তা'লা এমনসব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যেন ফেরেশতাদের স্বরূপ সম্পর্কে জগদ্বাসী অবহিত হতে পারে।

বর্তমান যুগের মুসলমানদের (মস্তিষ্কের) কাল্পনিক ফেরেশতা

কয়েকদিন পূর্বে এক আর্ষ বলল, মুসলমানরা দিন দিন ইসলামবিমুখ হয়ে চলেছে। এর প্রমাণ হিসেবে এ কথাটিও উপস্থাপন করে যে, সৈয়দ আমীর আলী সাহেব লিখেছেন, ‘ফেরেশতারা এক কাল্পনিক অস্তিত্ব, তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই’ অথচ তিনি একজন মুসলমান!। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অধুনা মুসলমানদের মনমস্তিষ্কে যে-সব ফেরেশতা রয়েছে তারা কাল্পনিকই, কেননা তারা জানেই না যে, ফেরেশতা কী আর তাদের ওপর ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা কী এবং তাদের দ্বারা কী কল্যাণ সাধিত হতে পারে? কিন্তু আমি যেমনটি এখনই বলে এসেছি যে, ঈমানের অন্তর্গত কোনো বিষয়ই বৃথা নয় বরং এর অনেক কল্যাণ রয়েছে। অতএব এটি যেহেতু এমন এক বিষয় যার প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো আগ্রহ নেই তাই এর দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা আবশ্যিক। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে ফেরেশতাদের বিষয়েও আপত্তি করা হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'লার কৃপায় আমরা তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি আর সেভাবেই প্রমাণ করতে পারি যেভাবে দৃষ্টির আড়ালে থাকা অন্য আরো বহু জিনিসের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়। ফেরেশতাদের সম্পর্কে আমরা এমনসব প্রমাণাদি দিতে পারি যা প্রত্যেকের বোধগম্য হওয়া সম্ভব, তবে শর্ত হলো, তাদের চোখে যেন বিদ্বেষের পর্দা না থাকে।

ফেরেশতা বলতে কি কিছু নাই?

অধুনা শিক্ষার প্রভাবে মুসলমানদের মাঝে সাধারণত এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, ফেরেশতাদের কোনো অস্তিত্বই নেই বরং মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয়ে যে শক্তি মাথাচাড়া দিত তার নামই ফেরেশতা রেখে দেওয়া হয়েছে। জিবরাইল বা মিকাইল নাম ব্যবহার করার কারণ হলো, মানুষের মাঝে যেহেতু তাদের ধারণা বিরাজমান ছিল আর এই নামগুলো প্রচলিত ছিল তাই নিজের কথাকে অধিক কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এদের নাম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আমরা দেখি, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব এত গুরুত্ব-সহকারে স্বীকার করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'লার পর সবচেয়ে বেশি যদি কোনো বিষয় দেখা যায় তবে তা হলো ফেরেশতাদের বিষয়। একান্ত বর্বর ও অসভ্য জাতিসমূহের অবস্থা থেকেও জানা যায় যে, তারা ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। এমন অনেক ধর্ম রয়েছে যেগুলোর শিক্ষা এখন পৃথিবীতে পাওয়া যায় না কিন্তু তাদের পুরাকীর্তি হতে ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া বর্তমানে যে-সব ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোতে তো একান্ত স্পষ্টভাবে তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অন্যান্য ধর্মে ফেরেশতাদের উল্লেখ

প্রাচীন ধর্মসমূহের মধ্যে জরথুষ্ট্রীয় ধর্মে (ফেরেশতাদের) সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধর্মের অনুসারীরা যত পরিস্কারভাবে ফেরেশতাদের বিষয়ে উল্লেখ করেছে (যদিও তারা এতে ভুলও করেছে), আমাকে আক্ষেপের সাথে স্বীকার করতে হয় যে, মুসলমানরা ততটা করে নি। তারা ফেরেশতাদের বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করেছে।

এরপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইহুদীধর্ম। এটি যেহেতু প্রায় নতুন ধর্ম এবং খুব বেশি কাল পূর্বের ধর্ম নয়, তাই এর শিক্ষা কিছুটা হলেও সংরক্ষিত হয়ে আসছে। এতে ফেরেশতাদের সম্পর্কে বহু আদেশ-নিষেধ বা শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। এরপর রয়েছে হিন্দু ধর্ম। এ ধর্ম যদিও অনেক প্রাচীন তথাপি এদের ধর্মেও ফেরেশতাদের সম্পর্কে শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে; তবে বর্তমানে তারা এসবের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে চীনাদের প্রাচীন গ্রন্থাবলিতে ফেরেশতাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া মিশর ও গ্রিক সভ্যতার প্রত্নতত্ত্ব হতেও ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন বর্বর জাতি, যাদের নামও জানা যায় না তাদের রেখে যাওয়া ছাপ ও প্রবাদ ইত্যাদি হতেও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। কোথাও

ডানাবিশিষ্ট প্রাণির উল্লেখ পাওয়া যায় যারা মানুষকে শাস্তি দিয়ে থাকে। আবার কোথাও কয়েক হাজার বছরের পুরানো এমন সব চিত্রকর্ম পাওয়া যায় অর্থাৎ পালক বিশিষ্ট কোনো সৃষ্টি ওপর হতে নীচের দিকে অবতরণ করতে দেখা যায়। এসব থেকে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে ফেরেশতাদের বিষয়ে ধারণা বিদ্যমান ছিল।

যাহোক, প্রত্যেক জাতিতেই ফেরেশতাদের সম্পর্কে ধারণা ছিল বলে জানা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি জরথুষ্ট্রীয় ধর্মে, এরপর ইহুদীদের মাঝে এবং তারপর হিন্দু ধর্মে (ফেরেশতাদের সম্পর্কে ধারণা) পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহেও এ ধারণা পাওয়া যায়। খ্রিষ্টধর্মেও এর উল্লেখ রয়েছে। এমনকি সেইন্ট পলও এ বিতর্কের অবতারণা করেছে যে, এদের (ফেরেশতাদের) উপাসনা করা যাবে কি না? এ থেকে জানা যায় (ফেরেশতা-সংক্রান্ত) যে শিক্ষা রয়েছে এর প্রভাব সকল হৃদয়ে ছিল। প্রত্যেক জাতির মাঝে খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস দেখে যেভাবে মানুষ বলতে পারে যে, আদি থেকেই সবাই খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস লালন করে আসছে আর তাই এটি খোদা তা'লার অস্তিত্বের একটি প্রমাণ। ঠিক সেভাবে সেসব জাতি যাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির মাঝে পরস্পর কোনো মিল নাই, যাদের পরস্পরের সাথে সম্পর্ক থাকার কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না, তা সত্ত্বেও তাদের সবাইকে ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী দেখা যায়। অতএব এটি ফেরেশতাদের অস্তিত্বের এক জোরালো প্রমাণ।

জরথুষ্ট্রীয় ধর্মে ফেরেশতাদের উল্লেখ

জরথুষ্ট্রীয়দের মাঝে অদ্ভুত এক বিষয় পাওয়া যায় আর তা হলো, তাদের মাঝে ফেরেশতাদের যে-সব নাম পাওয়া যায় সেসব নাম এবং যে নাম মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান সেগুলো পরস্পর সাদৃশ্য রাখে। এছাড়া তাদের কাজও পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাদের বিশ্বাস হলো, খোদা দু'জন। একজন অন্ধকারের ও অপরজন আলোর। আলোর খোদার অভিপ্রায় হলো, অন্ধকারের খোদাকে দুর্বল করে দেওয়া। উপরন্তু আরো বলে, এক সময় আসবে যখন অন্ধকারের খোদা দুর্বল হয়ে যাবে। পুণ্যের খোদাকে 'ইয়াযদান' আর পাপের খোদাকে 'আহরোমানাহ'; আর সাধারণত 'আহরিমান' বলে অর্থাৎ অন্ধকারের মানুষ। এই নাম থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, এর অর্থ (সে) শয়তান ছিল, খোদা ছিল না। কিন্তু তারা বলে, খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এটি পাপের খোদা আর সে-ই পাপকর্ম করায়।

যরাখুস্ত্রীয়দের ধর্মীয় গ্রন্থ আবেস্তায় বড়ো ফেরেশতাকে ‘উমিশিয়া’ বলে যা উমীশ থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে অবিনশ্বর। যা থেকে বোঝা যায়, তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতারা অমর হয়ে থাকে। যেভাবে মানুষের আত্মাকে লয় থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে তদ্রূপ তাদেরকেও অমর জীবন দান করা হয়েছে।

যরাখুস্ত্রীয়দের বিশ্বাস হচ্ছে, ফেরেশতারা সকল পুণ্য ও ধর্মের উৎস আর নীতিগতভাবে খোদা তা’লার বিকাশস্থল। তাদের ধারণা বা বিশ্বাস হলো, সহস্র সহস্র বছর উন্নতির চেষ্টা করার পর ফেরেশতারা নিজেদের বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর তারা ফেরেশতাদের সম্পর্কে মনে করে, তারা অনন্য ও অমূল্য রত্ন যারা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকলেও আমাদের জন্য উপকারী। তারা মণিমুক্তা আখ্যায়িত হতে পারে না কেননা এটি তাদের অবমাননা হবে। তারা গাছে ফোটা ফুল নয় বরং তারা নক্ষত্রের ন্যায় যারা সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে। তারা খোদার জন্য শোভা নয় বরং তাঁর সত্তার বিকাশস্থল।

যরাখুস্ত্রীয়দের গ্রন্থাবলিতে সবচেয়ে বড়ো ফেরেশতার নাম ‘ওহুমানাহ্’ লেখা রয়েছে। তাকে ‘ওহশতামানাহ্’ও বলা হয়। অর্থাৎ সর্বোত্তম ফেরেশতা। ‘ওহুমানাহ্’-এর অর্থ হচ্ছে, সংশোধনকারী পুণ্য হৃদয় ফেরেশতা। হিব্রু এবং আরবীতে ‘জবর’-এর অর্থও সংশোধন। তাই উভয় নামের সামঞ্জস্যের নিরিখে বোঝা যায়, ‘ওহুমানাহ্’ মূলত জিবরাইলেরই নাম।

যরাখুস্ত্রীয়দের গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায়, মানুষের মস্তিষ্ক সেই ফেরেশতার মাধ্যমে জ্যোতি লাভ করে থাকে। বরং যরাখুস্ত্র খোদা তা’লার সমীপে দোয়া করেছিল, নূর এবং এলহামের জ্যোতিতে যেন তিনি ‘ওহুমানাহ্’-এর দর্শন লাভ করেন, আর অবশেষে সেই ফেরেশতার সাথে (তার) সাক্ষাৎ হয়। সকল পুণ্য প্রেরণা সেই ফেরেশতার কাছ থেকে বা মাধ্যমে আসে। আর যারা সেই ফেরেশতার সৃষ্ট প্রেরণাসমূহকে গ্রহণ করে না (তখন) সেই ফেরেশতা তাদের পরিত্যাগ করে।

যরাখুস্ত্রীয়দের বিশ্বাসমতে আরেকজন ফেরেশতা হচ্ছে, ‘আশা’। অর্থাৎ তাকওয়ার ফেরেশতা। বাহ্যিক উপকরনের মধ্যে অগ্নি ‘আশার’ কর্তৃত্বে, কেননা নূর (জ্যোতি) আগুন থেকে সৃষ্টি হয় আর তাকওয়া নূর থেকে উৎপন্ন হয়। মনে হয়, এটি মীকাঈল ফেরেশতা; কেননা মীকাঈল হচ্ছে জাগতিক উন্নতি প্রদানের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফেরেশতা আর জাগতিক উন্নতির চিহ্ন হচ্ছে অগ্নি।

এই দুই ফেরেশতা ছাড়াও তারা আরো পাঁচজন বড়ো ফেরেশতায় বিশ্বাস রাখে আর ছোটো ফেরেশতার সংখ্যা তো গণনার উর্ধ্বে। পুরো ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বড়ো

ফেরেশতাদের স্কন্ধে অর্পিত। তারা মনে করে, ফেরেশতারা সবসময় মানুষের হৃদয়ে পবিত্র প্রভাব বিস্তার করে যেন শয়তান সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। তারা আরো বলে থাকে, জন্ম খোদার পক্ষ থেকে আর মৃত্যু শয়তানের পক্ষ থেকে। এ কারণে তারা বিশ্বাস করে যে, জন্ম যেহেতু খোদার পক্ষ থেকে হয় তাই মানুষ পবিত্রই জন্ম নেয় আর ফেরেশতারা তার সুরক্ষা করে। তবে শয়তান তাকে পাপের শিক্ষা দেয়। মানুষ যদি শয়তানের কথা মান্য করে, তাহলে ফেরেশতা তাকে এই বলে ছেড়ে চলে যায় যে, এ এখন শয়তানের দাস। এছাড়া তাদের ধারণা হলো, খোদা ও শয়তানের মাঝে ততদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকবে যতদিন না ইরানী বংশোদ্ভূত একজন নবীর জন্ম হয় যার নাম, ‘মুসীউয রবহমী’ অর্থাৎ পবিত্র মসীহ নামে একজন নবী আসবেন— যিনি যরতশত এর বংশধর হবেন। কিন্তু দৈহিক সন্তানদের মধ্য হতে নয় কেননা লেখা আছে সে সেই স্ত্রীর গর্ভে হবে যার (গর্ভ) থেকে কোনো সন্তান হয় নি।

তার যুগে শয়তানের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে। সে খোদা তা’লার কাছে প্রার্থনা করবে, খুবই ভয়াল যুদ্ধ (তাই) তুমি ফেরেশতা অবতীর্ণ করো। তখন খোদা তা’লা ফেরেশতা অবতীর্ণ করবেন। শয়তান মোকাবিলা করতে করতে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তখন সেই নবী ফেরেশতাদের সহায়তায় তার (অর্থাৎ শয়তানের) ওপর সর্বশেষ আক্রমণ হানবেন আর ভয়াবহ যুদ্ধ হবে— যাতে শয়তান পরাস্ত হবে। সে ধরা পড়বে এবং মারা যাবে। এরপর শান্তিপূর্ণ (পরিবেশ) সৃষ্টি হবে আর এই বিশ্ব অনেক বিস্তৃতি লাভ করবে— কারণ কোনো মানুষ মারা যাবে না কেননা যে মৃত্যুর সাথে সম্পর্কযুক্ত শয়তান সে নিজেই মারা যাবে।

বোঝা যায় যে, একথাগুলো একজন নবীর বক্তব্য। কেননা তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং পূর্ণ হচ্ছে। ‘মুসীউয রবহমী’ (অর্থাৎ পবিত্র মসীহ) আগমন করেছেন আর সেসব নিদর্শন-সহ এসেছেন যা বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া একথা অন্যান্য নবী (আ.)ও বলেছেন, শয়তানের সাথে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে। অতএব এখন (তা) হচ্ছে। মানুষকে সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ করার জন্য বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে যাতে মানুষ খোদাকে ছেড়ে দেয়। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মানুষকে সত্য খোদার সাথে মিলিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে আর এটি এক চরম বিভীষিকাময় যুদ্ধ।

আকাশ থেকে ফেরেশতা যাচনা করার কথাও সঠিক প্রমাণিত হয়েছে যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি কাশফ বা দিব্যদর্শন রয়েছে যাতে তিনি (আ.) খোদার কাছে এক লক্ষ ফেরেশতা যাচনা করেন আর খোদা তা’লা বলেন,

এক লক্ষ ^১ (অনেক) বেশি, পাঁচ হাজারই যথেষ্ট। (তায়কেরা, পৃ. ১৭৮, চতুর্থ সংস্করণ)। পবিত্র কুরআনে যেহেতু সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার ফেরেশতার উল্লেখ আছে তাই সে পরিমাণই দেওয়া হয়েছে, এর চেয়ে বেশি দেওয়া হয় নি। বস্তুত একথাও সত্য প্রামাণিত হয়েছে।

জরথুষ্ট্রীয়দের মধ্যে ফেরেশতাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেক বিশদ আলোচনা দেখা যায়। যদিও তারা ভুল করেছে কিন্তু তাদের বই-পুস্তকে এমন এমন বিষয় বিদ্যমান যা দেখে, বলা যেতে পারে— ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম যদি ফেরেশতাদের বিষয় বর্ণনা করে থাকে তাহলে তা করেছে জরথুষ্ট্র ধর্ম।

ইহুদী ধর্মে ফেরেশতাদের উল্লেখ

এরপর ইহুদীদের মাঝেও ফেরেশতা-সংক্রান্ত শিক্ষা বিদ্যমান। তারা জিবরাইল (আ.)-কে অগ্নির ফেরেশতা বলে, কিন্তু তারা ভুল করেছে। কেননা এই নামই জরথুষ্ট্রীয়দের মধ্যেও পাওয়া যায় কিন্তু তারা তাকে বাণী বহনকারী ফেরেশতা বলে। এই নাম যেহেতু পূর্বেই তাদের (তথা ইরানীদের) মাঝে বিদ্যমান ছিল আর ইহুদীদের মাঝে পরে এসেছে এবং ইরান থেকে তাদের দেশান্তরিত হবার পর এসেছে; অতএব যে-সব ইহুদীর কাছে থেকে এই নাম নিয়েছে তাদের মাঝে তাকে রহতম ও বাণী বহনকারী ফেরেশতা মানা হয়। তাই (তাকে) অগ্নির ফেরেশতা বলা ভুল। এছাড়া আমরা বাইবেলেও দেখতে পাই যে, তাকে রহমতের ফেরেশতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তালমূদ-এ বর্ণিত আছে, দানিয়াল নবীর যুগে যে-সব মানুষকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তাদের উদ্ধারকর্তা ছিলেন জিবরাইল (আ.)।

যেমন, লেখা আছে, ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপের প্রাক্কালে জিবরাইল খোদা তা'লাকে বলেন, তাঁকে রক্ষা করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। খোদা তা'লা বলেন, তোমাকে এর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। ইবরাহীমও পৃথিবীতে একজন আর আমিও এক— তাই আমিই তাকে রক্ষা করব। এটি মূলত সে কথাই যা আমাদের মাঝে প্রচলিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপ করার প্রাক্কালে জিবরাইল (আ.) তাঁর কাছে এসে বলেন, আমার কাছে কিছু প্রার্থনা কর। তিনি বলেন, আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না। তখন সে বলে, তাহলে খোদার কাছে চাও। তিনি বলেন, খোদার কাছে চাওয়ার প্রয়োজন কী? আমার কী অবস্থা তা কি তিনি দেখেন না?

^১ তায়কেরায় ফেরেশতা-র পরিবর্তে 'ফওজ' শব্দ আছে।

তালমূদে রয়েছে, খোদা তা'লা জিবরাইলকে বলেন, তুমি নয় বরং আমি ইবরাহীম (আ.)-কে রক্ষার জন্য যাবো, কিন্তু আমি তোমার এই পুণ্যকে বিনষ্ট করব না। ভবিষ্যতে ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তানদের মধ্য হতে একজনকে বাঁচানোর জন্য তোমাকে অনুমতি প্রদান করব। অতঃপর দানিয়াল (আ.)-এর যুগে যাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় খোদা তা'লা তাদেরকে রক্ষার জন্য জিবরাইল (আ.)-কে অনুমতি প্রদান করেন আর তিনি তাদের উদ্ধার করেন।

মোদ্দাকথা, ইহুদীদের মাঝেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফেরেশতাদের উল্লেখ রয়েছে আর তাদেরকে খোদার পুত্র বলা হয়েছে।

হিন্দুধর্মে ফেরেশতাদের উল্লেখ

একইভাবে হিন্দুদের মাঝেও ফেরেশতাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, অরুণ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ এদেরকে এমন আত্মা জ্ঞান করে— যাদের পূজা করা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল ফেরেশতা, যারা খোদার বাণী নিয়ে আসত কেননা ওয়াহ্মানাহ্ এবং অরুণা নাম একজনেরই মনে হয়। ওয়াহ্মানাহ্-এর সম্পর্কও সূর্যের সাথে বলে বলা হয় আর অরুণা-এর (সম্পর্ক)ও সূর্যের সাথেই। কিন্তু ভুলবশত এটি মনে করা হতে থাকে যে, সূর্যের সাথে যেহেতু তাদের সম্পর্ক রয়েছে তাই সূর্য হলো খোদা, আর এভাবেই সূর্যকে খোদা বলে গণ্য করতে আরম্ভ করে।

সূর্যের সাথে যে এর সম্পর্ক এতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমনটি ইসলামে সূর্যের সাথে জিবরাইলের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও লিখেছেন, এর (অর্থাৎ জিবরাইলের) সম্পর্ক সূর্যের সাথে। জিবরাইল (আ.)-এর সম্পর্ক মহানবী (সা.)-এর সাথে আর পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-কে সূর্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যে-সব কুফরি ফতোয়া দেওয়া হয়েছে সেগুলোর একটি যা লেখা হয়েছে তা হলো, তিনি (আ.) ফেরেশতাদের (অস্তিত্বকে) অস্বীকার করেন। হযরত সাহেব (আ.) তৌযীহে মারাম এবং আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম (পুস্তকে) ফেরেশতাদের সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন আর পবিত্র কুরআনের আলোকে তিনি (আ.) প্রমাণ করেছেন যে, ফেরেশতার সম্পর্ক মহাজাগতিক বস্তুনিচয়ের সাথে রয়েছে এবং তাদের সাহায্যে পৃথিবীতে সেগুলোর প্রভাব পড়ে থাকে। এ কারণে আলেমরা এ মর্মে ধোঁয়াশা সৃষ্টি

করে তাঁর বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া জারী করে যে, তিনি নাকি ফেরেশতাদের (অস্তিত্বে) অবিশ্বাসী আর নক্ষত্ররাজির প্রভাবে বিশ্বাসী।

নক্ষত্ররাজির বিষয়টি একটি ভিন্ন বিষয়। এখন আমি সে সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করতে চাই না, কেননা এর ফলে আলোচনা অন্যদিকে গড়াবে। আপাতত আমি এটি বলতে চাই যে, সকল ধর্মেই ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস বিদ্যমান আর ইসলামেও, যেখানে শত শত শিরক-সংক্রান্ত বিষয়ের খণ্ডন করা হয়েছে সেখানে ফেরেশতাদের (প্রতি) বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আর এত বেশি গুরুত্ব-সহকারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, যদি তাদের না মানা হয় তাহলে মানুষ কাফের হয়ে যায়। আর সব ধর্মের প্রতি ইসলামের অনুগ্রহ হলো, নবীদের বিরুদ্ধে যত আপত্তি করা হয়েছে যেভাবে ইসলাম সেসব দূর করেছে বা খণ্ডন করেছে, একইভাবে ফেরেশতাদের সম্পর্কে যত আপত্তি বর্তায় তা-ও দূর করেছে।

জরথুষ্ট্রীয়দের এবং ইহুদীদের বিশ্বাস হলো, ফেরেশতারাত্তর শয়তানের ফাঁদে পা দেয় আর তাদের অনুকরণেই মুসলমানরা হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে এই বিশ্বাস ধারণ করে যে, শয়তানের ফাঁদে পা দেবার কারণেই তাদেরকে অদ্যবধি বাবেল শহরের কোনো কূপের মধ্যে উলটো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। (তফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারার سُلَيْمَانَ عَلَىٰ مُلْكِهِ الشَّيَاطِينُ আয়াতের তফসীর।) কিন্তু কুরআন থেকে জানা যায়, ফেরেশতা এমন এক সৃষ্টি যারা খোদার নির্দেশ ছাড়া কিছুই করেন না। অতএব (কুরআনে) বর্ণিত হয়েছে,

(আত-তাহরীম: ৭) لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

[অনুবাদ: আল্লাহ তাদের যে আদেশ দেন তারা (তার) অবাধ্যতা করেন না। আর তাদের আদেশ দেওয়া হয় তারা তা-ই (পালন) করে।]

এখন যেহেতু বোধগম্য হলো যে, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস এমন একটি বিষয় যে সম্পর্কে সকল জাতির মতৈক্য রয়েছে তাই প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। এটি কোনো অনেক বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে তাই তো সকল ধর্মীয় গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে। কুরআন থেকে জানা যায়, এটি এত প্রাচীন বিশ্বাস যে, হযরত নূহ (আ.)-এর যুগেও বিদ্যমান ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য আল্লাহ তা'লা উদ্ধৃত করেন যে,

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ۚ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

অর্থাৎ, [হযরত নূহ (আ.)-এর] অস্বীকারকারী দলের নেতারা বলল, এই ব্যক্তি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, যে তোমাদের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে চায়। আর আল্লাহ্ চাইলে ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করতেন। আমরা তো এমন কথা (আমাদের) পূর্ববর্তী পুণ্যবানদের মধ্যে শুনি নি (যে, তাদের মধ্যে রসূল আসতেন)। (আল-মুমিনুন: ২৫)

মহানবী (সা.)-এর প্রতিও এই আপত্তি করা হয়েছে—

(আল-হিজর: ৮) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

অর্থাৎ, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের কাছে কেন ফেরেশতাদের নিয়ে আসো না? এ থেকে বোঝা যায়, আরবের লোকদের মাঝেও ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ইসলামী শিক্ষার দিকে আসছি আর বলছি যে, ফেরেশতা সম্পর্কে ইসলাম কী শিক্ষা দিয়েছে?

ফেরেশতাদের স্বরূপ

প্রথম কথা হলো, ফেরেশতা সৃষ্টি কি-না? কেননা তাদেরকে যে পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে এতে ধারণা জন্মে যে, ফেরেশতা সৃষ্টি নয়। অতএব, এ কারণেই খ্রিষ্টানরা ভুল করেছে। তারা ধরে নিয়েছে, রুহুল কুদ্স সৃষ্টি নয় বরং খোদার অংশ তাই একেও খোদা বানিয়ে বসেছে। কিন্তু ইসলাম বলে, একথা ভুল যে, ফেরেশতার সৃষ্টি নয়। তারা সৃষ্টি। যেমন, ফেরেশতার যা সৃষ্টি এর প্রমাণ পবিত্র কুরআন থেকে পাওয়া যায়। খোদা তা'লা বলেন,

(আস-সাফাত: ১৫১) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ

অর্থাৎ, ফেরেশতাদের সৃষ্টি করার সময় তারা কি সেখানে উপস্থিত ছিল যে তারা বলে, ফেরেশতারা নারী?

এথেকে বোঝা গেল, খোদা তা'লাই ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন। তবে এটি ভিন্ন কথা যে, তারা নশ্বর কি না? যেভাবে মানুষের আত্মাগুলোকে সংরক্ষিত রাখা হবে একইভাবে ফেরেশতাদেরও বিলুপ্ত হতে দেওয়া হবে না বা সবাইকে বিলুপ্ত হতে দেওয়া হবে না। অথবা সব ধ্বংস হয়ে যাবে বা কতক ধ্বংস হবে আর কতক অবশিষ্ট থাকবে (এমন নয়)।

ইহুদীদের ধারণা হলো, যখন এলহাম হয় তখন সেই এলহামের শব্দাবলির কল্যাণে এমন আলোড়ন সৃষ্টি হয় যাতে সহস্র সহস্র ফেরেশতার জন্ম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসও হয়ে যায়। কিন্তু জরথুষ্ট্রীয়রা ফেরেশতাকে অবিদ্যমান জ্ঞান করে।

ফেরেশতাদের সম্পর্কে দ্বিতীয় যে বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে তা হলো, এরা এমন আধ্যাত্মিক সৃষ্টি যে, বান্দাদের চর্মচোখে তাদেরকে আসল দেহে দেখা সম্ভব নয়। আর চর্মচোখে যদি দেখা যায় তাহলে নিজেদের মূল অস্তিত্বের পরিবর্তে ভিন্ন কোনো অস্তিত্বে থাকবে। মোটকথা, ফেরেশতাদের দেখার জন্য এই চর্মচোখে কাজে লাগবে না বরং আধ্যাত্মিক চোখের প্রয়োজন হবে। আর চর্মচোখে দেখা গেলে ফেরেশতারা নিজেদের আসল রূপে থাকবে না। যেমনটি আল্লাহ তা'লা বলেন, **وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَكَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ** (আল-আন'আম: ১০)

এরা বলে, ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ হয় না? কিন্তু ফেরেশতা আসলে মানব আকৃতিতেই আসবে আর কেবল তবেই দেখতে পাবে। আর মানব আকৃতিতে আসলে বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হবে যে, ইনি কি ফেরেশতা না মানুষ? অথবা এরা এখন যে সন্দেহ সৃষ্টি করছে তা বলবৎ থাকবে অর্থাৎ, এই বাণী খোদার নয় বরং মানুষের বানানো। অতএব, ফেরেশতা আমরা পাঠাতাম, যদি এতে কোনো লাভ হতো। কিন্তু চর্মচোখে যেহেতু মানুষের জন্য ফেরেশতাদের দেখা সম্ভব নয় আর দেখলেও মানবাকৃতিতে দেখতে পারে, তাই এক্ষেত্রে তারা আবার আপত্তি করবে যে, ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না।

কাজেই, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অদৃশ্য, চর্ম চোখে (তাদের) দেখা যায় না।

এ সম্পর্কে তৃতীয় যে বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে তা হলো, তারা এমন সৃষ্টি যে, তারা নরও নয় আর নারীও নয়। এ বিষয়টি সেই আয়াত থেকে জানা যায় যা আমি পূর্বে পাঠ করেছি অর্থাৎ, **أَمْرٌ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ** (আস-সাফাত: ১৫১)। এখানে খোদা তা'লা একথা বলেন নি যে, তারা পুরুষ। বরং বলেছেন যে, তারা বলেন, ফেরেশতারা নারী। তারা কি জানে যে, এরা কী? খোদা তা'লা যখন ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন তখন কি তারা (সেখানে) উপস্থিত ছিল? ফেরেশতাদের 'নারী' হবার বিষয়টি খোদা তা'লা অস্বীকার করেছেন কিন্তু এর সঙ্গে এটি বলেন নি যে, তারা 'নর'। কাজেই তাদেরকে নর বা নারী বলা ভুল। লিপ্সের বিষয়টি শুধু বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে, আধ্যাত্মিক সৃষ্টিতে নর ও নারী হয় না। এমন নয় যে, পুরুষের আত্মা হলো নর আর মহিলাদের নারী। নর ও নারী তো পেয়ালার মতো, এর মধ্যে যে বস্তু থাকে তা এক ও অভিন্ন।

ফেরেশতাদের সম্পর্কে চতুর্থ যে বিষয়টি জানা যায় তা হলো, তাদের তিনটি ধরন রয়েছে। তারা সবাই এক ধরনের নয়। যেমনটি আল্লাহ তা'লা বলেন,

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (আল-মুমিন: ৮)

এই আয়াত দ্বারা তিন প্রকারের ফেরেশতা সম্পর্কে জানা যায়। দু'ধরনের ফেরেশতার প্রমাণ কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং তৃতীয় প্রকারের ফেরেশতার উল্লেখ কুরআন ও হাদীসে ইঙ্গিতে বিদ্যমান। কেননা এতে বলা হয়েছে, এক তো সেসব ফেরেশতা যারা আরশ বহন করছে, আরেক প্রকারের ফেরেশতা হলো তারা যারা আরশের চতুষ্পার্শ্বে থাকে। অর্থাৎ এক হলো সেসব ফেরেশতা যাদের মাধ্যমে খোদার নির্দেশাবলি প্রবর্তিত হয়। আরেকদল ফেরেশতা হলো তারা যারা তাদের নায়েব বা সহকারী আর তাদের নির্দেশাবলিকে নিম্ন পর্যায়ে বহনকারী। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদের আরো একটি শ্রেণি আছে যারা এই আরশের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের চেয়ে নিম্নস্তরের। অন্যান্য হাদীস থেকেও এটি সত্যায়িত হয়। কেননা এ থেকে বোঝা যায় কতক ফেরেশতা বিভিন্ন জিনিসের দায়িত্বে নিয়োজিত, তারা حَمَلَةُ الْعَرْشِ এবং مَنْ حَوْلَهُ ছাড়া তৃতীয় প্রকার ফেরেশতা। জরথুষ্ট্রীয়দের মধ্যেও এ বিষয়ের কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। কেননা তারা বলে, সাতজন ফেরেশতা রয়েছে, যারা পৃথিবীর (সকল) কার্যক্রম পরিচালনা করে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, কেয়ামত দিবসে আটজন ফেরেশতা খোদা তা'লার সিংহাসনকে বহন করবে। সিংহাসন বলতে স্বর্ণ-রৌপ্যের সিংহাসন নয় বরং সেই উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলি বোঝানো হয়েছে যা দ্বারা খোদা তা'লার ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পায়। পরজগতে তা আটজন ফেরেশতার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে কিন্তু যেমনটি দলিলপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, ইহজগতে (তা) সাতজন ফেরেশতার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে।

কাজেই এক তো হলো সেসব ফেরেশতা যারা খোদার আরশ বহন করছে আর দ্বিতীয়ত হলো তারা যারা তাদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কিন্তু তারা খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত আর তারা হলো এসিসটেন্ট বা সহকারীর মতো। তাদের ওপর মূল দায়িত্ব অর্পিত থাকে না বরং (প্রথমোক্ত) ফেরেশতাদের সাহায্যকারী হয়ে থাকে; আর তৃতীয় প্রকার হলো তারা- যারা নিম্ন পদমর্যাদার।

মোটকথা ফেরেশতা তিন প্রকারের।

১. তারা যারা খোদার গুণাবলির বিকাশস্থল।
২. তারা যারা তাদের সাহায্যকারী এবং খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত।
৩. তারা যারা বিভিন্ন ছোটোখাটো দায়িত্বে নিয়োজিত আর তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়, কেননা খোদা তা'লা বলেন,

(আল-মুদাসসির: ৩২) وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

কোনো মানুষ এদের সম্পর্কে ধারণাই করতে পারে না। কেননা নবীদের উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক কাজের জন্যই পৃথক পৃথক ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে।

পঞ্চম যে বিষয়টি জানা যায় তা হলো, ফেরেশতারা এমন সৃষ্টি যারা মন্দকাজ করতেই পারে না। মানুষের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তারা কেবল নবী নয় বরং খোদাকেও অস্বীকার করে বসে। আর এমন মানুষও আছে যারা খোদাকে গালি দেয়। কিন্তু কুরআন থেকে জানা যায়, ফেরেশতারা এমন সৃষ্টি যে, তাদের মাঝে পাপ করার শক্তিই নেই আর মানুষের তুলনায় তাদের কর্মগুণি সীমিত হয়ে থাকে। মানুষ সীমাতিক্রম করে কিন্তু ফেরেশতাদের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করা আছে (তারা) তা অতিক্রম করতে পারে না। যেমনটি আল্লাহ তা'লা বলেন,

(আত-তাহরীম: ০৭) لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থাৎ, ফেরেশতারা খোদার নির্দেশ অমান্য করে না আর তা-ই করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ষষ্ঠ বিষয় হলো, ফেরেশতারা যে শুধু মাত্র খোদার নির্দেশ অমান্য করে না তা-ই নয় বরং তাদের মাঝে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, (তারা) খোদার নির্দেশাবলি পূর্ণরূপে সম্পাদন করে। কোনো নির্দেশ অমান্য করা ভিন্ন বিষয় হয়ে থাকে আর সেটি পূর্ণরূপে করতে না পারা ভিন্ন কথা। উদাহরণস্বরূপ, একজন দুর্বল মানুষকে যদি বলা হয় যে, অমুক জিনিস উত্তোলন করো কিন্তু সে নিজ দুর্বলতার কারণে যদি তুলতে না পারে তাহলে এটি বলা হবে না যে, সে নির্দেশ অমান্য করেছে। তবে, এমন এক ব্যক্তি যে উত্তোলনের শক্তি রাখে, সে যদি তুলতে অস্বীকার করে তাহলে এটি হবে (নির্দেশ) অমান্য করা। ফেরেশতাদের সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন, তাদের মাঝে এমন যোগ্যতা থাকে যে, তাদেরকে যে কাজই করতে বলা হয় তারা তা ব্যক্তিগতভাবে করার সামর্থ্য রাখে অর্থাৎ সবার মাঝেই তা করার শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের মতো নয় যে, কতকের মাঝে নির্দেশ পালনের শক্তি থাকলেও

কতকের মধ্যে থাকে না। যেমন, (আল্লাহ তা'লা) বলেন,

(আন-নাহল: ৫১) وَيُفَعِّلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

(অর্থাৎ,) তাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা তা পালন করে, মানুষের অবস্থা এমন হয় না। মানুষ অনেক সময় একটি কাজ করতে চাইলেও করতে পারে না। উদহারণস্বরূপ দাঁড়িয়ে নামায পড়তে চায় কিন্তু অসুস্থ হলে তা করতে পারে না।

সপ্তম কথা: ফেরেশতাদের সম্পর্কে এটি জানা যায় যে, তারা পারিপার্শ্বিক প্রভাব গ্রহণ করে না। অন্যান্য সৃষ্টি যতই শক্তিশালী হোক, তারা প্রভাবিত হয় না। তবে যা ঘটে তা হলো, কিছু প্রভাব গ্রহণ করে আবার কিছু প্রভাব গ্রহণ করে না। যেমন নবীদের নিন, তারা পুণ্যের প্রভাব গ্রহণ করেন। অথবা যদি লড়াই হয় আর তারা তাতে জড়িত থাকেন তাহলে মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ওপরও প্রভাব পড়বে। তবে নবীরা মন্দ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকেন। কিন্তু ফেরেশতারা সকল অর্থে সুরক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন খোদা তা'লা বলেন,

(আত-তাহরীম: ০৭) عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ

ফেরেশতাকুলের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা غَلَاظٌ و شِدَادٌ হয়ে থাকে। অন্য কোনো জিনিস তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। হ্যাঁ, তাদেরকে যে জিনিসের ওপর প্রভাব ফেলতে বলা হয় তার ওপর (তারা) অবশ্যই প্রভাব ফেলে থাকে কিন্তু মানুষের মাঝে এই সামর্থ্য নেই। কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে থাকে আর কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে সামর্থ্য থাকে না। অর্থাৎ কিছু বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মানুষও তদ্রূপ হয়ে থাকে, কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। যেমন— খোদা তা'লা বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ

(আল-ফাতাহ: ৩০)

অর্থাৎ, মু'মিনরাও أَشِدَّاءُ হয়ে থাকে, কিন্তু কাফেরদের ওপর। নিজেদের মাঝে তারা একে অপরের প্রভাব গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে বলা হয়েছে:

(আত-তওবা: ৭৩) يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ, হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের মোকাবিলা করো, কিন্তু তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। অতএব মু'মিনদের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য থাকে যে, তারা অন্যদের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু তাদের প্রভাব গ্রহণ করে না, তবে তা কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে। আর ফেরেশতারা সর্বক্ষেত্রেই এমন হয়ে থাকে, অর্থাৎ কখনো প্রভাব গ্রহণ করে না।

অষ্টম কথা এই যে, তাদের সংখ্যা মানুষের জন্য অগণিত। যেমন, খোদা তা'লা বলেন, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (আল-মুদাসসির: ৩২)

ফেরেশতাদের সংখ্যা (কেবল) খোদা তা'লাই জানেন, অন্য কেউ তা জানতে পারে না।

নবম কথা: এটি জানা যায় যে, তাদের মাঝে কর্মকর্তা ও অধীনস্থ হয়ে থাকে। শুধু এমন নয় যে, একজন বড়ো আরেকজন ছোটো, নিজ নিজ স্থানে নিজ কাজে সবাই স্থায়ী বরং তারা কর্মকর্তা ও অধীনস্থ হবারও মর্যাদাও রাখে। যেমন একস্থানে আল্লাহ তা'লা বলেন, فَلْيَتَوَقَّعْكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي يُبَلِّغُكُمْ إِلَيْنَا تَرْجِعُونَ (আস-সাজদা: ১২)

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, তোমাদের রুহ কবজ করবে মৃত্যুর ফেরেশতা, যার ওপর তোমাদের প্রাণ বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তোমরা নিজেদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অপর একস্থানে (আল্লাহ) বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ ۖ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (আল-আন'আম: ৯৪)

অর্থাৎ, আর তুমি যদি সেই ক্ষণকে দেখতে পেতে যখন কিনা সীমালঙ্ঘনকারীরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় জর্জরিত থাকবে আর ফেরেশতারা তাদের দিকে নিজেদের হাত প্রসারিত করে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করো। আল্লাহ তা'লা সম্পর্কে তোমাদের অন্যায় কথা বলা এবং তাঁর নিদর্শনাদি থেকে অহংকারবশত মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে আজ তোমাদের লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দেওয়া হবে।

অনুরূপভাবে তিনি বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتٌ أَنفُسُهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ (আন-নিসা: ৯৮)

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা, যাদের রুহ ফেরেশতারা এমন অবস্থায় কবজ করবে যে, তারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করবে। ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে, তোমরা কোন খেলালে ডুবে আছো?

এখন এই তিনটি আয়াতকে একত্রে দেখো, প্রথমোক্ত আয়াতে এটি বলা হয়েছে যে, সব মানুষের প্রাণ বের করার দায়িত্ব কেবল একজন ফেরেশতার কাঁধে অর্পণ করা হয়েছে। পরের উভয় আয়াতে এটি বলা হয়েছে যে, প্রাণ বহু ফেরেশতা বের

করে থাকে। যা থেকে জানা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা একজন হলেও তার সহকারী বহু ফেরেশতা রয়েছে, যারা তার আনুগত্যে উক্ত কাজ সম্পাদন করে। যেখানে মৃত্যুর ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তা ও অধীনস্থ হবার নিয়মকে দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে, সেখানে অন্যান্য বিষয়াদিকেও একইভাবে অনুমান করা যায় অর্থাৎ যে-সব কাজ ফেরেশতাদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে, তা সম্পাদনের দায়িত্ব কয়েকজন বড়ো ফেরেশতার কাছে প্রদান করা হয়েছে। আর এরপর তাদের অধীনে অগণিত (ফেরেশতার) একটি দল কর্মরত থাকে।

দশম কথা: ফেরেশতাদের মাঝে মানুষের চেয়ে সীমিত শক্তি হয়ে থাকে। ফেরেশতারা একই অবস্থায় থাকে, কিন্তু মানুষ অনেক উন্নতি করতে পারে। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٣﴾

(আল-বাকার: ৩২-৩৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আদমকে সমস্ত নাম শিখিয়ে দেন আর এরপর ফেরেশতাদের সামনে সেসব জিনিস, যেগুলোর নাম শিখিয়েছিলেন, উপস্থাপন করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আমাকে এগুলোর নাম বল যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তারা বলে, তুমি পবিত্র। আমাদের কোনো জ্ঞান নেই, কেবল ততটুকু ব্যতিরেকে যা তুমি আমাদের শিখিয়েছ। নিশ্চয় তুমি সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান। এরপর আল্লাহ্ তা'লা আদম (আ.)-কে সেগুলোর নাম বলতে বলেন আর তিনি বলে দেন।

এখানে কথা প্রসঙ্গে আমি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছি যে, খোদা তা'লা স্বয়ং কেন নাম বলে দেন নি? আদম (আ.)-কে দিয়ে কেন বলিয়েছেন? তো এতে এই প্রজ্ঞা নিহিত ছিল যে, যদি খোদা তা'লা বলতেন তাহলে এর মাঝে সকল গুণাবলি চলে আসত। হযরত আদম (আ.)-কে বলা হয়েছে যে, তুমি বল, অর্থাৎ তারা যেন তোমার দিকে তাকায়। মোটকথা, ফেরেশতাদের শক্তি মানুষের চেয়ে সীমিত হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফেরেশতারা যা কিছু করে, খোদা তা'লার নির্দেশ এবং ইচ্ছা অনুযায়ী করে থাকে। কোনো প্রকার অবাধ্যতা তারা করতে পারে না।

একাদশ কথা: এটি জানা যায় যে, ফেরেশতাকুলের মাঝে ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, কিন্তু খুবই সীমিত। এর উদাহরণ এমনিই যেমনটি কি-না ঘোড়ার গলায় লম্বা রশি

পরিণে নড়াচড়া করার জন্য যদি একটি খুঁটির সাথে বেঁধে দেওয়া হয় যেন নড়াচড়া করতে পারলেও নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে যেতে না পারে (ঠিক তেমনই) ফেরেশতারাও একটি কেন্দ্রের চারপাশে গতিময় থাকে এবং সেই গণ্ডির বাহিরে যেতে পারে না। সেই গণ্ডি হলো—لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (আত-তাহরীম: ০৭)। এই গণ্ডির বাহিরে তারা যেতে পারে না। ফেরেশতাদের ইচ্ছার বিষয়টি পৃথিবী থেকেও জানা যায় যে, তারা হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে বলে,

(আল-বাকার: ৩১) أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

এটি তারা খোদা তা'লার কাছে জানতে চেয়েছে যে, আমাদের বুঝিয়ে দিন, আদম (আ.) পৃথিবীতে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে— তার জন্য কী ব্যবস্থা থাকবে? এই প্রশ্ন করা বলছে যে, একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তাদের মাঝে ইচ্ছাশক্তি থাকে, যা মন্দ পর্যন্তও পৌঁছে না আবার পুণ্যকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু এই আয়াত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তারা জিজ্ঞেস করেছে। কেউ হয়ত বলতে পারে যে, হতে পারে খোদা তা'লা এলহাম করেছেন যে, জিজ্ঞেস কর, তাই তারা জিজ্ঞেস করেছে। প্রথমত এই কথাটিই ভুল যে, তারা খোদা তা'লার বলার কারণে জিজ্ঞেস করেছে। কেননা এরপর খোদা তা'লা বলেন, اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ তোমরা যদি এই প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে নাম বল। এটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের জিজ্ঞেস করা খোদার ইচ্ছার অধীনে ছিল না। অতঃপর হাদীসেও আমরা এমন বিষয় দেখি যেগুলো থেকে ফেরেশতাদের ইচ্ছার কথা প্রকাশ পায়। যেমন— এক ব্যক্তি এক আলেমের কাছে যায় এবং গিয়ে বলে, আমি এতটা পাপ করেছি, আমি কি তওবা করতে পারব বা আমার জন্য কি পুণ্যের জগতে ফিরে আসা সম্ভব? সে বলে, তোমার তওবা গৃহীত হবে না। সে তাকে হত্যা করে আর এরপর আরেক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় যেন তার কাছে তওবা করতে পারে, কিন্তু পথিমধ্যেই সে মৃত্যুবরণ করে। এতে জান্নাতের ফেরেশতারা বলে, আমরা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাব কেননা সে তওবার নিয়ত বা সংকল্প করেছিল। আর দোষখের ফেরেশতারা বলে, আমরা তাকে দোষখে নিয়ে যাব, কেননা সে তওবা করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে (মুসলিম কিতাবুত তওবা, বাব কবুলু তওবাতিল কাতিলে ওয়া ইন কাসুরা কাতলুহু)। এটি থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাকুলের মাঝে ইচ্ছা থেকে থাকে। এরপর এ আয়াত থেকেও জানা যায়। আল্লাহ তা'লা বলেন:

(সোয়াদ: ৭০) مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

আমি তো সেই বিতর্কের অবস্থা অবগত ছিলাম না যখন ফেরেশতারা পরস্পর বিতর্ক করছিল। এ থেকে জানা যায় যে, তারা একে অপরের সাথে তর্কও করে। অতএব তাদের মাঝে ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান তবে খুবই সীমিত পরিসরে।

দ্বাদশ কথা: ফেরেশতাদের সম্পর্কে এটি জানা যায় যে, তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْوَاءِ ۖ إِنِّي كُنتُمْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ ﴿٣٢﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

(সাবা: ৪১-৪২)

আর যেদিন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে একত্র করবেন। অতঃপর ফেরেশতাদের বলবেন, এরা কি তোমাদের ইবাদত করত? তারা বলবে, তুমি পবিত্র, তাদের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক। আমাদের বন্ধু তো তুমি। তারা তো জিনদের ইবাদত করত। আর তাদের অধিকাংশ তাদের ওপর ঈমান আনয়ন করত।

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না কেননা তাদের যদি অদৃশ্যের জ্ঞান থাকত তাহলে তারা ইবাদত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কথা বলতো না। এটি বলা যেতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'লা এমনিতেই প্রশ্ন করেছিলেন, কেননা এমন পরিস্থিতিতে বিনা কারণে প্রশ্ন করাও একপ্রকার মিথ্যা হয়ে যায়, আর আল্লাহ্ তা'লার সত্তা অতি পবিত্র। দ্বিতীয়ত: পূর্বের কিতাবসমূহ থেকে জানা যায় যে, কতিপয় লোক ফেরেশতাদের ইবাদত করা যায় বলে বিশ্বাস পোষণ করত।

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, কতিপয় ফেরেশতা জ্ঞান না থাকার কারণে এ কথা অস্বীকার করবে যে, কিছু কিছু মানুষ তাদের ইবাদত করত। কতিপয় হাদীস থেকেও এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, ফেরেশতারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। মহানবী (সা.) বলেন, এক ব্যক্তি মু'মিন আখ্যায়িত হয় এবং মু'মিনসুলভ কাজ করে। লেখক ফেরেশতারা যখন তার আমল নিয়ে খোদা তা'লার সমীপে উপস্থাপনের জন্য যায়, যেমন- সে যদি নামায পড়ে আর তারা তার এই কর্মকে খোদার সমীপে উপস্থাপন করলে তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে এই আওয়াজ আসে যে, তা ফিরিয়ে নিয়ে যাও আর গিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারো। এই নামায সে আমার জন্য পড়ে নি।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ফেরেশতারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। যদি থাকত তাহলে তারা কি এমন নামায নিয়ে যেত যা গ্রহণযোগ্য নয়?

ত্রয়োদশ কথা: এটি জানা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের দায়িত্বে ভিন্ন ভিন্ন ফেরেশতা থেকে থাকে। যেমন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! উহদের দিনের চেয়েও অধিক কষ্ট কি আপনি কখনো পেয়েছেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আকাবার দিন, যখন মক্কাবাসীদের (সত্যকে) অস্বীকার করা দেখে আমি আবদে ইয়ালীল* এর জাতির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি কিন্তু তারা কর্ণপাত করে নি বরং আমার কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। এতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে কোনো দিক নির্ধারণ না করেই একদিকে চলে যাই। পথে আমি মেঘের একটি টুকরো দেখি, যাতে আমি জিবরাইলকে দেখতে পাই আর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'লা তোমার জাতির কথা শুনে এবং তাদের বিরোধিতা দেখে পাহাড়ের ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি (হে মুহাম্মদ!) তাকে যে আদেশ দিবে সে তা-ই করবে। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে সালাম দেয় এবং বলে, আপনি কি চান যে, আমি 'আখশাবিন' (অর্থাৎ মক্কার চতুর্পার্শ্বের দুটি পাহাড়) তাদের ওপর গড়িয়ে দেই? অর্থাৎ সেগুলোতে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়ে তারা ধ্বংস হয়ে যাক? আমি বললাম, না। আমি আশা করি যে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমন পুণ্যবান হবে যারা এক খোদার উপাসনা করবে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ০৩, পৃ. ১৩৫-১৩৭, বৈরুত থেকে ১৯৬৬ সনে প্রকাশিত সংস্করণ)

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিবরাইল (আ.) মহানবী (সা.)-কে বলেছেন যে, খোদা তা'লা পাহাড়ের ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁর (সা.) সাহায্য করে। নিজের সম্পর্কে বলেন নি যে, আমি সাহায্যের জন্য এসেছি। এটি থেকে স্পষ্ট হয় যে, পাহাড়ের ফেরেশতা ভিন্ন ছিল। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের দায়িত্বে ভিন্ন ভিন্ন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে।

চতুর্দশ কথা: এটি জানা যায় যে, ফেরেশতার বিভিন্ন ঐশী গুণাবলির বিকাশস্থল হয়ে থাকে। কিছু কোনো একটি শক্তির আর কিছু একের অধিক শক্তির বিকাশস্থল হয়ে থাকে। অতএব খোদা তা'লা বলেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِ
اٰجِزَةً مَّثْنٰی وَثُلٰثَ وَرُبْعَ ۚ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢﴾

(আল-ফাতির: ২)

*তার পুরো নাম হলো আবদে ইয়ালীল বিন আমর বিন উমায়ের। সে তায়েফের নেতৃস্থানীয়দের এক লোক ছিল। তার সম্পর্ক ছিল বনু সাকীফ গোত্রের সদস্য ছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম আরবী, খণ্ড: ২, পৃ. ৬০, মিশর থেকে ১৯৩৬ সনে প্রকাশিত সংস্করণ)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি ফেরেশতাদের রসূল বানিয়ে প্রেরণ করেন যাদের মধ্য থেকে কতিপয় দুটি, কতিপয় তিনটি এবং কতিপয় চারটি বৈশিষ্ট্যের বিকাশস্থল হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'লা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিও করেন। আর আল্লাহ তা'লা সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

উক্ত আয়াত থেকে এ বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ফেরেশতা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশস্থল হয়ে থাকে, কেউ স্বল্প গুণের আর কেউ অধিক গুণের। এই বিষয়টিও জানা যায় যে, যে যুগের জন্য যতটা প্রয়োজন হয় তদ্রূপ সামর্থ্যবান ফেরেশতাদের প্রেরণ করা হয়। সেসব ফেরেশতাকেই মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে যাদের মাঝে সেই লোকদের অনুরূপ যোগ্যতা থাকে। আর যখন জগৎ পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করে তখন খোদা তা'লা জিবরাইল (আ.)-কে তার পূর্ণরূপে প্রেরণ করেন যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন যে, যে পূর্ণ কিতাব নিয়ে এসেছে তার ছয়শ ডানা রয়েছে।* এ থেকে জানা গেল যে, জিবরাইল (আ.) খোদা তা'লার ছয়শ গুণের বিকাশস্থল। একথা বলা ভুল হবে যে, খোদা তা'লার গুণাবলি তো কয়েকটি মাত্র, তাহলে তিনি ছয়শ গুণের বিকাশস্থল কীভাবে হলেন? খোদা তা'লার অগণিত গুণাবলি রয়েছে আর ছয়শ তো কেবল সেগুলো যা মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খুবই সূক্ষ্ম একটি কথা লিখেছেন, তা হলো, পবিত্র কুরআনের জ্ঞান মহানবী (সা.) জিবরাইলের চেয়ে অধিক রাখতেন এবং এটি একান্ত সঠিক কথা। এর কারণ হলো, ফেরেশতারাত্তর তাঁর (সা.) সাহায্যে নিয়োজিত ছিল আর তারা মহানবী (সা.)-এর অন্যান্য গুণের ফেরেশতা ছিল।

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, ফেরেশতারাত্তর বিভিন্ন গুণের বিকাশস্থল হয়ে থাকে। আর **جَزْحَةٍ** শব্দের অর্থ ডানা নয় বরং গুণাবলি, যা তাদের মাঝে পাওয়া যায়।

এগুলো হলো সেসব কথা যা থেকে ফেরেশতাদের সম্পর্কে অনুমান করা যায় যে, তারা কীরূপ সৃষ্টি। এই বর্ণনা থেকে **مَلَكٌ** শব্দটির পাশাপাশি কেউ কেউ ফেরেশতাদের কিছু কিছু গুণের কথাও জেনে থাকবে। এখন আমি তাদের কাজ সম্পর্কে বলছি।

* বুখারী, কিতাবুত তফসীর, সূরা নাজম, বাব কাউলুহু ফাআউহা ইলা আবদিহি মা আউহা

ফেরেশতাকুলের কাজ

ফেরেশতাদের অনেক বড়ো একটি কাজ হলো, তারা খোদার বাণী নিয়ে আসে। অতএব খোদা তা'লা বলেন,

(আল-হাজ্জ: ৭৬) **اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ**

আল্লাহ তা'লা ফেরেশতা ও মানুষের মাঝ থেকে রসূলদের নির্বাচিত করেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ফেরেশতাদের একটি কাজ খোদার বাণী পৌঁছানো।

ফেরেশতাদের দ্বিতীয় কাজ প্রাণ বের করা বা রুহ কবজ করা; যেমন, খোদা তা'লা বলেন,

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
(আস-সাজদা: ১২)

অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের রুহ কবজ করে, যার ওপর তোমাদের প্রাণ বের করে নেবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর তোমরা নিজ প্রতিপালক-প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

ফেরেশতাদের তৃতীয় কাজের কথা যা জানা যায় তা হলো, সেসব দুষ্ট লোক, যারা নবীদের বিরোধিতা করে, তাদের ওপর তারা শাস্তি নিয়ে আসে। সেই ফেরেশতারা যখন দুষ্টদের কাছে যায় তখন তাদের মাঝে এমন চৌম্বকীয় শক্তি সৃষ্টি হয় যাতে দুষ্টরা পুড়ে যায়। যেভাবে পেট্রলের পাশে আগুন জ্বালালে তাতে আগুন ধরে যায়, অনুরূপভাবে দুষ্টরা পেট্রলের ন্যায় হয়ে থাকে আর ফেরেশতারা আগুনের ন্যায়। তাদের সংস্পর্শে আসলে দুষ্টরা পুড়ে যায়। আর যখন তারা তাদের কাছে আসে তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۖ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا كَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ
(আল-আন'আম: ১৫৯)

তারা কি ফেরেশতাদের আসার অপেক্ষায় আছে? তারা যদি চলে আসে তাহলে একদিকে তারা আসবে আর অপরদিকে এরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা তাদের জন্য স্কুলিংয়ের ন্যায় আর এরা তাদের সামনে বারুদের ন্যায়।

ফেরেশতাদের চতুর্থ কাজ হলো, তারা মু'মিনদের সাহায্য করে। কাফেরদের জন্য তো তারা স্কুলিঙ্গ যে, তাদের নিকটবর্তী হতেই তারা পুড়ে যাবে। কিন্তু মু'মিনরা তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে আর তারা তাদেরকে সাহায্য করে। অতএব খোদা তা'লা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾
نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣٢﴾

(হা মীম আস-সাজদা: ৩১-৩২)

অর্থাৎ এমন মানুষ যারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক-প্রভু আর এরপর তারা এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং কোনো জিনিস তাদেরকে তা থেকে বিচ্যুত করতে পারে না তাদের প্রতি ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় আর তারা বলে, তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, তোমরা ভীত হয়ো না। আমরা তোমাদের সাহায্যকারী, এ পৃথিবীতে এবং পরলোকেও। আর জান্নাতে তোমরা যা-ই চাইবে তা পাবে। এ থেকে বোঝা গেল, কোনো কোনো ফেরেশতার কাজ মু'মিনদের সাহায্য করা।

এছাড়া পঞ্চম যে কাজটি রয়েছে তা হলো, ফেরেশতারা দৃষ্টিগোচর হলে তারা কাফের ও মুশরিকদের ধ্বংস করে দেয়। তাদের আরেকটি কাজ হলো মানুষের সাথে থাকা প্রত্যেক ফেরেশতা নবী এবং তাঁর জামা'তের প্রতাপ মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করা। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١﴾
(আলে ইমরান: ১২৫)

অর্থাৎ তোমাদের জন্য কি এটি যথেষ্ট নয় যে, তিন হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যার্থে আসুক? তিন হাজার ফেরেশতা কেন বলেছেন? এর কারণ হলো, এখানে শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা এতজনই ছিল। এ থেকে বোঝা যায়, এরা উচ্চপর্যায়ের ফেরেশতা ছিল না, বরং তারা ছিল সেই ফেরেশতা যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন একজন করে যুক্ত আছে, কেননা (আল্লাহ্) বলেছেন, এটি

কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করি। অর্থাৎ তোমরা যখন শত্রুর মোকাবিলা করতে যাবে তখন তারা প্রত্যেকের হৃদয়ে তোমাদের ভীতি সঞ্চার করবে। যেমন তিনি এরপর বলেছেন,
(আলে ইমরান: ১৫২) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

অর্থাৎ কাফেরদের হৃদয়ে ভয় সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব প্রত্যেক মানুষের সাথে যে ফেরেশতা থাকে সে (শত্রুর হৃদয়ে) নবী এবং তাঁর জামাতের ভয় সঞ্চার করতে থাকে। ভয় সৃষ্টির দৃষ্টান্ত এ যুগেও পাওয়া যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর বিরোধীদের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, মুবাহালা করুন কিন্তু কেউই সামনে দাঁড়াতে পারে নি। এর কারণ হলো, যখনই তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা চিন্তা করে তখনই ফেরেশতা তাদের হৃদয়ে এ ভীতি সঞ্চার করে যে, মারা পড়বে। এজন্য তারা পথ থেকে সরে দাঁড়ায়।

সেসময় আমি শিমলা গিয়েছিলাম সেসময় এক আর্ঘ আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে। (তার সাথে) বেদ সম্পর্কে আলোচনা হয়। আমি (তাকে) বলি, বিভিন্ন বেদের সত্য হওয়া সম্পর্কে তোমাদের যদি একীণ বা দৃঢ়বিশ্বাস থেকে থাকে তাহলে কসম খাও। সে বলে, আমি কসম খেতে প্রস্তুত। তখন আমি বলি, এভাবে কসম খাও যে, এটি যদি সত্য না হয় তাহলে আমার স্ত্রী-সন্তানদের ওপর শাস্তি নিপতিত হোক। সে বলে, এটি বলা সম্ভব নয়, এটি বলতে ভয় লাগে। আমি বলি, আমি তো কুরআন সম্পর্কে এ ধরনের কসম খেতে প্রস্তুত আছি। তখন সে বলে, এটি অনেক সাহসিকতার বিষয়। আমি বলি, আমার যখন দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, কুরআন সত্য এবং এটি খোদার বাণী তখন সাহস কেন থাকবে না?

এটিই হলো মূলকথা যে, এমন মানুষের মনে ফেরেশতারা ভয় সৃষ্টি করে। বর্তমান যুগেও এর উদাহরণ বিদ্যমান। কেননা বার বার মুবাহালা করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কেউই সামনে দাঁড়াতে পারে নি। সম্প্রতি সুফিবাদের দাবিদার হাসান নিজামী নামের এক ব্যক্তির উদ্ভব ঘটেছে। তিনি লিখেছেন, আমার কাছে আসো, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে প্রাণ বের করে নেব। অবশেষে সে এমনভাবে লাক্ষিত হয়েছে যে, একদম চূপ মেরে গেছে। এরপর দেওবন্দীদের দেখুন! তারা কত বিজ্ঞাপন লিখেছে ও প্রচার করেছে কিন্তু যখন আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তরই দেয় না যা কয়েক মাস পূর্বেই প্রচার করা হয়েছে তা থেকে এটিই স্পষ্ট যে, মুবাহালার চিন্তা করলেই তাদের হৃদয়ে ভ্রাস ছেয়ে যায়।

হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে বলল, আবু জাহল আমার প্রতি অন্যায় করেছে, আপনি এর ন্যায়বিচার করুন। আমি তার কাছে এত টাকা পাই কিন্তু সে তা পরিশোধ করে না। মহানবী (সা.) তাকে সাথে নিয়ে আবু জাহলের কাছে গেলেন আর গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি কি তোমার কাছে এত টাকা পায়? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ সে পায়। তখন মহানবী (সা.) বললেন, পরিশোধ করে দাও আর তৎক্ষণাৎ সে টাকা বের করে দিয়ে দিল। একথা শোনার পর লোকেরা আবু জাহলকে লজ্জা দিয়ে বলল, এটি তুমি কী করলে? অথচ তুমিই তো আমাদের বলে বেড়াতে, মুসলমানদের সম্পদ হরণ করা বৈধ, তাহলে তুমি কেন তা দিয়ে দিলে? উত্তরে সে বলল, তোমরা জানো না! তখন আমার মনে হচ্ছিল, দুটি উন্মত্ত উট আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যদি কিঞ্চিৎ অস্বীকার করি তাহলে সেগুলো আমাকে চিরে ফেলবে। এটি আসলে ভীতি ছিল যা ফেরেশতা তার হৃদয়ে সঞ্চার করেছিল।^১ এককথায় ভীতির সঞ্চার করাও ফেরেশতাদের কাজ।

ফেরেশতাদের ষষ্ঠ কাজ হলো, তারা আল্লাহর তওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে। যেভাবে আল্লাহ তা'লা বলেন,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٩﴾ (আলে ইমরান: ১৯)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লাও স্বীয় তওহীদ তথা একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন আর ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দেয়। কাজেই ফেরেশতারা একত্ববাদ প্রমাণের জন্য উপকরণ সরবরাহ করে।

ফেরেশতাদের সপ্তম কাজ হলো, তারা নবীদের সত্যতা তুলে ধরে। মানুষ নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, কিন্তু তারা হৃদয়গুলোতে এ চিন্তাধারার উদ্বেক ঘটায় যে, ইনি মিথ্যা নবী নন। অতএব আল্লাহ তা'লা বলেন,

لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلَكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٤﴾ (আন-নিসা: ১৬৭)

বলা হয়েছে, খোদা সাক্ষ্য দেন— তোমার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আমার পক্ষ থেকে আর ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দেয়।

ফেরেশতারা কয়েকভাবে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ— স্বপ্নে নবীর সত্যতা প্রকাশ করে থাকে। এক ব্যক্তি নবীর শত্রু আর তাঁকে সে মিথ্যা মনে করে, কিন্তু ফেরেশতার স্বপ্নের মাধ্যমে তার হৃদয়ে এমন বিষয়ের উদ্বেক ঘটে যার ফলে সে নবীকে মেনে নেয়। আসলে বিষয়টি হলো, ফেরেশতা এমন সময়ের প্রতীক্ষায় থাকে যে, কখন অমুক ব্যক্তির হৃদয়ে পুণ্যকর্মের ইচ্ছা জাগ্রত হবে আর প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন সময় আসে, সে আবু জাহল হোক বা ফেরাউন। আর পুণ্যকর্ম করার সময় হলে ফেরেশতা তা থেকে সুযোগ নেয় এবং মনের মাঝে নবীর সত্যতা সঞ্চর করে। পরবর্তীতে তা থেকে উপকৃত হওয়া বা না হবার বিষয়টি মানুষের নিজের ওপর নির্ভর করে।

অতএব ফেরেশতাদের একটি কাজ হলো, মানুষের হৃদয়ে তারা নবীদের সত্যতার প্রেরণা সঞ্চর করা অব্যাহত রাখে।

ফেরেশতাদের অষ্টম কাজ হলো, তারা খোদা তা'লার পবিত্রতা ঘোষণায় রত থাকে। যেমন, আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾

(আয-যুমার: ৭৬)

এখান থেকে বোঝা যায় ফেরেশতারা আল্লাহ তা'লার পবিত্রতা ঘোষণা ও গুণকীর্তনে রত থাকে।

ফেরেশতাদের নবম কাজ হলো, তারা মু'মিনদের জন্য এস্তেগফার করে। এরা বিশেষ ফেরেশতা হয়ে থাকে। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাদের অবশ্যকরণীয় কাজ মু'মিনদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফারে লেগে থাকা যেন মু'মিনের পক্ষ থেকে যদি কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাহলে খোদা যেন সেটিকে ঢেকে দেন। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

الَّذِينَ يَخِطُّونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (আল-মু'মিন: ৮)

এ থেকে বোঝা যায়, বিশেষ বিশেষ ফেরেশতার কাজ হলো, তারা বিশেষ বিশেষ মু'মিনের জন্য তারা দোয়ায় রত থাকে যেন খোদা তাদের দুর্বলতাগুলো ক্ষমা করে দেন। এছাড়া সাধারণ ফেরেশতারা সবার জন্য দোয়ায় লেগে থাকে; কেবল সাধারণ মু'মিনদের জন্য নয় বরং কাফেরদের জন্যও দোয়া করে। এভাবে মু'মিনরা দ্বিগুণ উপকৃত হয়। তাদের জন্য একদিকে বিশেষ ফেরেশতারা দোয়া করে আর অপরদিকে সাধারণ ফেরেশতারা সবার জন্য দোয়া করলে তাতেও মু'মিনরা অন্তর্ভুক্ত থাকে। সবার জন্য দোয়া করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَالْمَلِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ

(আশ-শূরা: ৬)

অর্থাৎ খোদার রহমানিয়াতের (অর্থাৎ করুণা বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত) ফেরেশতারা সবার জন্য এই বলে দোয়া করতে থাকে যে, ক্ষমা করে দাও। আমার মতে দোষখ বা জাহান্নাম খালি করার জন্য আল্লাহ তা'লা এই পথটি (খোলা) রেখেছেন। আল্লাহ তা'লা ফেরেশতাদের দোয়ার ফলে অবশেষে বলবেন, যাও! আমি সবাইকে ক্ষমা করছি।

ফেরেশতাদের দশম কাজ হলো, তারা প্রকৃতির নিয়ম পরিচালনার চূড়ান্ত কারণ আর পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তার সবই ফেরেশতাদের প্রভাবের ফলে ঘটছে। যেমন- বৃষ্টি বর্ষিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্যের কিরণ (পৃথিবীতে) পৌঁছে, বিষ প্রভাব বিস্তার করে, প্রতিষেধক নিরোধ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এর সবই ফেরেশতাদের প্রভাবে হয়ে থাকে আর এমন কোনো জিনিস নেই যা তাদের প্রভাব ব্যতীত নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, বিষ স্বীয় সত্তায় বিষ নয় আর প্রতিষেধক নিজ গুণে প্রতিষেধক নয়। বরং এর অর্থ হলো, বিষ যে ফেরেশতার অধীনস্থ সেই ফেরেশতা অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত বিষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং যে ফেরেশতার অধীনে প্রতিষেধক সে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিষেধক কাজ করতে পারবে না। সব জিনিসের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। যেমন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে যে, বৃষ্টি বর্ষণ, তুফান সৃষ্টি-সহ আরো অনেক কাজ ফেরেশতাদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে। এটি একটি দীর্ঘ বিষয় আর এ ধরনের অনেক উদাহরণ পাওয়া সম্ভব। এছাড়া সুস্পষ্ট ১৫/২০টি উদাহরণ দেখা যায় যা থেকে বোঝা যায় যে, ফেরেশতারা প্রকৃতির নিয়মের বিভিন্ন

দিককে পূর্ণতা দিচ্ছে। গুটিকতক সুস্পষ্ট উদাহরণ থেকে এ বিষয়টি প্রকাশিত হলেও কেউ যদি বলে, সেগুলোর কারণে সব বিষয় সম্পর্কে কীভাবে কিয়াস বা অনুমান করা যেতে পারে? সেক্ষেত্রে এর উত্তর হলো, এই কিয়াস বা অনুমান ‘ইয়াহমিলুনা’ আরশা’ থেকে হতে পারে। কেননা ফেরেশতারা ই খোদার সকল গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে।

ফেরেশতাদের একাদশ কাজ হলো, তারা মানুষের পাপ ক্ষমার জন্য শুধু এস্তেগফারই করে না বরং এ দোয়াও করে যে, আল্লাহ্! তোমার বান্দাদের প্রতি বরকত বা আশিস বর্ষণ করো। এস্তেগফার করার অর্থ হলো, মানুষের দ্বারা যে-সব ভুলত্রুটি সংঘটিত হয় সেগুলোকে ঢেকে দেয়া। কিন্তু তারা দোয়া করে, (হে) খোদা! স্বীয় রহমত অবতীর্ণ করো। যেভাবে (পবিত্র কুরআনে) রয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾
(আল-আহযাব, ৫৭)

এসব ফেরেশতা খোদার রহমতের ছায়াতলে অবস্থান করে আর যখন কোনো ব্যক্তি খোদার পথে কাজ করে তখন ফেরেশতারা তার প্রতি আশিস বর্ষিত হবার জন্য দোয়া করে। তারা নিজেরা তো বরকত দিতে পারে না, তাই খোদার কাছে দোয়া করে যে, অমুকের প্রতি আশিস বর্ষণ করো। তাদের দরুদ প্রেরণও তেমনই হয় যেমনটি মহানবী (সা.) সম্পর্কে আমাদের হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেভাবে আমরা খোদার দরবারে নিবেদন করি, (হে খোদা!) মহানবী (সা.)-এর প্রতি তোমার আশিস বর্ষণ করো; অনুরূপভাবে তারাও প্রার্থনা করে যে, হে খোদা! তোমার বান্দার প্রতি তুমি দয়া করো। খোদা তা’লা বলেন, তোমরাও দোয়া করো কেননা খোদা নিজে এবং ফেরেশতারাও এ কাজে লেগে আছেন।

দ্বাদশ কাজ— ফেরেশতাদের মধ্যে থেকে কারো কারো দ্বাদশ কাজ হলো, তারা ইবাদত ছাড়া আর কিছুই করে না। তারা কেবল ইবাদতই করছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে আর এই পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এভাবে করতে থাকবে। যেভাবে হাদীস শরীফে আছে, সাত আকাশের এক পা পরিমাণ বা এক বিষত কিংবা হাতের তালু পরিমাণ জায়গাও খালি নেই। সব জায়গাতেই ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে অথবা সিজদায় কিংবা রুকুতে ইবাদত করছে। যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন সবাই বলবে, তুমি পবিত্র! আমরা সেভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি নি যেভাবে করার দায়িত্ব ছিল। তবে কেবল এতটুকু বলতে পারব যে, আমরা

কারো সাথে তোমার শরীক করি নি। ফেরেশতাদের একথা থেকে মু'মিনদেরও শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত কেননা এত ইবাদত করার পরও তারা বলবে, আমরা কিছুই করি নি। কিন্তু সামান্য ইবাদত করেই কিছু লোক বলে বসে, আমরা এত এত ইবাদত করেছি।

ফেরেশতাদের ত্রয়োদশ কাজ হলো, তারা মানুষের বিভিন্ন কর্মের সুরক্ষা করে। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٣﴾

(আল-ইনফিতার ১১-১৩)

তিনি বলেন, তোমাদের তত্ত্বাবধানে ফেরেশতাদের নিযুক্ত করা হয়েছে আর তাদের কাজ হলো, তোমাদের সেসব কর্ম লিপিবদ্ধ করা যা তোমরা বাহ্যত করে থাক। এখন বাকি থাকল নিয়্যতের বিষয়টি। এটি কেবল তারাই অবগত হয় যাদের ওপর নিয়্যতের হিসাব নেবার দায়িত্ব।

ফেরেশতাদের চতুর্দশ কাজ হলো, যারা আল্লাহ তা'লার প্রিয় তাদের ভালোবাসাকে তারা পৃথিবীময় ছাড়িয়ে দেয় এবং তাদেরকে তারা ভালোবাসতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحْبَبُهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحْبَبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

(বুখারী, কিতাব বাদয়ুল খালক, বাব যিকরুল মালায়েকা)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তিনি জিবরাইল (আ.)-কে ডেকে বলেন, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন। একথা শুনে জিবরাইল তাকে ভালোবাসাত শুরু করে। এরপর জিবরাইল উর্ধ্বলোকের সকল অধিবাসীকে ডেকে বলে, তোমরা তাকে ভালোবাসো। এতে করে উর্ধ্বলোকের সকল অধিবাসী তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে আর এরপর ভূপৃষ্ঠে তার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তৃত করা হয়।

বর্তমান যুগের এ দৃশ্য দেখে নাও। এটি সেই যুগ যখন সরকারকে মানুষ বলছে, তোমাদেরকে আমরা কেন মান্য করব? কিন্তু এ যুগেই মানুষ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাসত্ব বরণ করছে। আর যারা পরে এসে জামা'তভুক্ত হয় তারা আক্ষেপ করে বলে, কেন আমরা তাঁকে আগে মানলাম না! এটিই হলো ফেরেশতাকর্তৃক বিস্তৃত ভালোবাসা।

আল্লাহ তা'লার প্রিয়দের সত্যতার এই হলো একটি সূক্ষ্ম প্রমাণ। মিথ্যা দাবিদার দণ্ডায়মান হয় আর অনেক হৈ চৈ করে কিন্তু তাদেরকে কেউ জিজ্ঞেসও করে না। এযুগেরই একজন হলো জহির উদ্দীন ওরোপী এবং অপরজন আব্দুল্লাহ্ তিমাপুরী। বার বার তারা নিজেদের সম্পর্কে (পরিচিতিমূলক) পুস্তিকা লিখে ছাপিয়েছে এবং প্রকাশ করেছে, কিন্তু কেউই তাদের প্রতি কর্ণপাতও করে নি। অথচ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বেলায় দেখুন! তাঁর প্রতি ভালোবাসা কীভাবে পৃথিবীতে ছাড়িয়ে পড়েছে এবং ছড়াচ্ছে।

ফেরেশতাদের পঞ্চদশ কাজ হলো, কখনো কখনো খোদার প্রিয়দের সেবায় ফেরেশতাদের নিয়োজিত করা হয় আর প্রত্যাধিষ্টদের সেবক ও দাস বানিয়ে দেওয়া হয়। যেভাবে আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ
مَّسْنُونٍ ﴿١٩﴾ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ﴿٢٠﴾
(আল-হিজর, ২৯-৩০)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা ফেরেশতাদের বলেন, মাটি দিয়ে আমি মানুষ বানাতে যাচ্ছি। আমি যখন তাকে বানিয়ে শেষ করব এবং তার প্রতি আমার কালাম বা বাণী অবতীর্ণ করব, অর্থাৎ তাকে নবী বানাবো তখন তোমরা তার দাসত্বে বিনত হবে। বস্তুত বলা যায় ফেরেশতাদেরকে নবীর দাসত্বে নিয়োজিত করা হয় আর তারা নবীর পদমর্যাদার অধীনস্থ হয়ে যায়।

ফেরেশতাদের ষোড়শ কাজ হলো, তারা মানুষকে জ্ঞানদান করে এবং শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ যে-সব লোক জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোযোগী হয় তাদের অন্তরে জ্ঞানের আলো সঞ্চারের জন্য তাদের নিযুক্ত করা হয়। যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জিবরাইল (এক ব্যক্তির) রূপধারণ করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করে, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! ঈমান কী? দ্বীন বা ধর্ম কী? আর মহানবী (সা.) উত্তর দিতে থাকেন। তার চলে যাবার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের কি জানা আছে এই লোক কে ছিল? তারা বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমরা তো জানি না আপনিই বলে দিন, তিনি কে? তখন মহানবী (সা.) বলেন, সে ছিল জিবরাইল যে তোমাদের ধর্ম শেখানোর উদ্দেশ্যে এসেছিল। (বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব সাওয়ালু জিবরাইলান নাবীয়া আন ঈমানে ওয়াল ইসলামে)

অতএব জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াও ফেরেশতাদের একটি কাজ। কিন্তু কেবল ধর্মীয় জ্ঞানই নয় বরং জাগতিক বিষয়াদি সংক্রান্ত জ্ঞানও শিক্ষা দিয়ে থাকে আর কাফেরদেরকেও শিখিয়ে থাকে। আমি এডিসনের একটি বই পড়েছি। তিনি লিখেন, এমন একটি বিষয়ও নেই যা আমি নিজে উদ্ভাবন করেছি। আমার হৃদয়ে হঠাৎ করেই একটি বিষয়ের উদ্বেক হয় আর আমি সেটিকে বাস্তবে রূপ দেই। তিনি যেহেতু এ ধরনের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ রাখতেন তাই তাকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে। নবী এবং ওলী-আওলিয়াদের মাঝে যেহেতু ধর্মীয় জ্ঞানের আগ্রহ বিদ্যমান থাকে তাই তাদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান শেখায়।

ফেরেশতাদের জ্ঞান শেখানোর পদ্ধতিও অদ্ভুত হয়ে থাকে। তারা যে বিষয়গুলো শেখায় সেগুলোকে Objective Mind (সচেতন মন) রাখে না বরং Subconscious Mind (অবচেতন মনে) রাখে; অর্থাৎ মস্তিষ্কের পেছনের অংশে রাখে যাতে মানুষ তা চিন্তা করে বের করতে পারে। এতে মানুষের ভৌত মাথা অপেক্ষা সংরক্ষণ শক্তি বেশি থাকে আর এটি ভাঙার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফেরেশতারা যা কিছু শেখায় তা মস্তিষ্কের এই অংশেই সঞ্চয় করে।

মানুষের মস্তিষ্কের তিনটি অংশ থাকে। একটি অংশের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জিনিস দেখি ও উপলব্ধি করি। দ্বিতীয় অংশ ভাঙার হিসেবে কাজ করে। এই অংশে বিষয়াদি সংরক্ষিত রাখা হয় যা চিন্তা করলে মনে পড়ে। আর তৃতীয় অংশেও তথ্যভাঙার থাকে কিন্তু স্মরণ করতে চাইলেও তাতে যা-ই থাকুক না কেন মনে পড়ে না বরং অনেক খতিয়ে দেখার পর সে বিষয়টি মনে পড়ে। ফেরেশতা এই তৃতীয় অংশে জ্ঞান প্রবেশ করিয়ে থাকে আর প্রয়োজনের সময় এমনসব ঘটনার উদ্ভব ঘটে যে, সেই জ্ঞানের কথা মনে পড়ে যায়। এমনিতে স্বাভাবিকভাবে মনে করার চেষ্টা করলেও মনে পড়ে না। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমার বয়স তখন ১৭-১৮ হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ ছিল। সে যুগে আমি তাশহিয়ুল আযহান সম্পাদনা করতাম। আমি স্বপ্নে দেখি, একজন ফেরেশতা আসে। সেই ফেরেশতা আমাকে বলে, তোমাকে কি আমি কিছু শেখাবো? আমি বলি, শেখান। তিনি বলেন, সূরা ফাতেহার তফসীর শেখাই? আমি বলি, ঠিক আছে শেখান। এই স্বপ্নের দৃশ্যও অদ্ভুত ছিল। এর সূচনা যেভাবে হয়েছে তা হলো, প্রথমে আমি টিনের আওয়াজ শুনতে পাই আর এরপর এই ধ্বনি বিস্তৃত হতে থাকে এবং বিস্তৃত হতে হতে এক মাঠে রূপান্তরিত হয়। তাতে একটি চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে। দেখি, এ তো ফেরেশতা! তিনি আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিব?

আমি বলি, শেখান। তিনি বলেন, চল! সূরা ফাতেহার তফসীর শেখ। অতঃপর তিনি আমাকে শেখানো শুরু করেন এবং اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ইয়্যাকানা'বুদু)-তে পৌঁছে বলেন, বিগত তফসীরকারকগণ এ পর্যন্তই তফসীর লিখেছেন এর বেশি লেখেন নি। আমিও এখন মনে করি, আসলেই তাই। এরপর তিনি বলেন, কিন্তু আমি তোমাকে এর পরের অংশও শেখাচ্ছি। অতএব তিনি আমাকে সমস্ত সূরার তফসীর শেখালেন, এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখনও আমার এক দুটি কথা মনে ছিল যেগুলো সম্বন্ধে এখন শুধু এতটুকু মনে আছে যে, তা খুবই সূক্ষ্ম বিষয় ছিল কিন্তু পুনরায় ঘুমানোর পর যখন ঘুম থেকে উঠি তখন আমি তা-ও ভুলে গিয়েছিলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-কে আমি যখন এই স্বপ্ন শুনাই তখন তিনি এই বলে খুবই অসম্ভব হন যে, কেন তুমি তা তখনই লিখে রাখলে না? যা কিছুই শেখানো হয়েছিল তা তখনই লিখে ফেলা উচিত ছিল।

সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত সূরা ফাতেহা সম্পর্কে আমি কখনো বলি নি যে, আমাকে এর নতুন নতুন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বোঝানো হয় নি বা হচ্ছে না। আমি মনে করি, আমাকে শেখানো সেই জ্ঞানের কারণেই এমনটি হচ্ছে।

একবার আমার এই জ্ঞানের বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা হয়। আমাদের স্কুলের টিম খেলার জন্য অমৃতসর যায়। তখন যদিও আমি স্কুলের পড়ালেখা শেষ করে ফেলেছিলাম কিন্তু স্কুলের সাথে যোগাযোগ ছিল, কেননা স্কুল থেকে মাত্র বেরিয়েছিলাম, তাই আমিও তাদের সাথে যাই। সেখানে আমাদের ছেলেরা জয়লাভ করে। সেখানে মুসলমানরা একটি সভার আয়োজন করে যাতে আমাকে সেখানে বক্তৃতা করতে বলা হয়। আমি সেই সমাবেশে যাবার সময় পথিমধ্যে আমার সঙ্গীদের শোনাচ্ছিলাম যে, আমার সাথে খোদা তা'লার এমন ব্যবহার রয়েছে যে, আমি যখনই সূরা ফাতেহা সম্পর্কে বক্তৃতা করব তখন আমাকে নতুন নতুন তত্ত্ব বোঝানো হবে। সভায় আমি যখন বক্তৃতা করার জন্য দাঁড়িয়েছি তখন সূরা ফাতেহা ছাড়া আমার মুখে আর কোনো আয়াতই এলো না। অবশেষে আমি ভাবলাম, আমার পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে আর আমাকে বাধ্য হয়ে সূরা ফাতেহাই পড়তে হয়। আর সূরা ফাতেহা সম্পর্কে আমার মাথায় কিছুই ছিল না। আমি পড়তে হবে তাই পড়লাম কিন্তু উক্ত সূরা পাঠের পর তাৎক্ষণিক আমার মনে একটি নতুন গূঢ় কথা উদ্ভূত ঘটানো হয় আর তা হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন সূরা ফাতেহা অবতীর্ণ হয় তখন তাঁর সম্বোধিতরা ছিল কাফের, ইহুদী বা খ্রিষ্টানরা ছিল না। কিন্তু এই সূরায় দোয়া শেখানো হয়েছে যে, আমাদেরকে ইহুদী ও খ্রিষ্টান

হওয়া থেকে রক্ষা করো, আমরা যেন তাদের মতো না হই। অথচ সামনে যারা ছিল, দোয়া তাদের ব্যাপারে শেখানো উচিত ছিল যে, আমরা যেন এমন না হই। এতে যে গভীর প্রজ্ঞা বিদ্যমান তা হলো, মুশরিকরা যেহেতু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে তাই তাদের ব্যাপারে দোয়ার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু খ্রিষ্টান ও ইহুদী যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে তাই তাদের ব্যাপারে দোয়া শেখানো হয়েছে।

এই গুঢ় কথা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে বোঝানো হয়েছে এবং আমি খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা আদায় করেছি যে, সেই উপলক্ষ্যে তিনি আমার সম্মান রক্ষা করেছেন।

মোটকথা, যে জ্ঞান আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে শেখানো হয় তা প্রয়োজনে সব সময় কাজে আসে আর এটি মনে না থাকার মাঝে যে প্রজ্ঞা নিহিত আছে তা হলো, যদি সে বিষয়টি মনে থাকত তাহলে তা একবারের জন্যই হতো কিন্তু এভাবে এই জ্ঞান সব সময় কাজে লাগে।

এখন কেউ যদি কোনো আপত্তি করে আর কোনো হাফেজ না থাকে যার কাছে পবিত্র কুরআনের অন্য কোনো আয়াত জিজ্ঞেস করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লা আমাকে সূরা ফাতেহা থেকেই এর উত্তর শিখিয়ে দেন। অতএব ঐশী জ্ঞানে অনেক কল্যাণ নিহিত থাকে, অর্থাৎ যখনই প্রয়োজন হয় তখনই সেগুলো কাজে লাগানো যায়।

অতএব ফেরেশতার মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শেখানো হয়। মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) ফতুহাতে মক্কিয়া পুস্তকে লিখেছেন, “আমাকে অনেক জ্ঞান ফেরেশতা শিখিয়েছে” (ফতুহাতে মক্কিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬, মিশরে মুদ্রিত)। সুফিদেরও অনেকেই ফেরেশতা সম্পর্কে কথা বলেছেন যদিও তাদের আলোচনা বা বিশ্লেষণ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এক-দশমাংশও নয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বার বার বলতেন, কয়েক হাজার শব্দের মূল ধাতু তাঁকে শেখানো হয়েছে। আমিও আরো অনেক বিষয় ফেরেশতার মাধ্যমে শিখেছি। একবার পাপের বিষয়ে আমাকে এত ব্যাপক জ্ঞান দান করা হয়েছে যা ভেবে আমি হতবাক হয়ে যাই যে, কী অদ্ভুত ও বিস্ময়করভাবে দোষত্রুটি ও দুষ্কর্মের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

ফেরেশতার সপ্তদশ কাজ হলো, ফেরেশতা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে পুণ্যের প্রেরণা এবং সদাচারের ধ্যানধারণা সঞ্চর করে। এ কাজ সেই ফেরেশতার যে

প্রত্যেক মানুষের জন্য পৃথক পৃথকভাবে নিযুক্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাপনা, অর্থাৎ ফেরেশতা যে মানুষের হৃদয়ে পুণ্যের প্রেরণা যোগায় এই কাজ জিবরাইলী নিয়ন্ত্রণের অধীনেই হয়ে থাকে। যেমন, মহানবী (সা.) বলেন,

فِي الْقَلْبِ لِمَتَانِ لِمَتَةٌ مِنَ الْمَلِكِ إِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَلِلَّهِ مِنَ الْعُدُوِّ إِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَنَهْيٌ عَنِ الْخَيْرِ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

তিনি বলেন, মানব হৃদয়ে দু'ধরনের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। একটি হলো, ফেরেশতার পক্ষ থেকে পুণ্যের প্রেরণা সৃষ্টি আর সত্যের সত্যায়ন হয়। যার হৃদয়ে এমন প্রেরণা সৃষ্টি হয় তার বুঝে নেওয়া উচিত যে, এটি আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে। এক্ষেত্রে তার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। অপরটি হলো, শত্রুর পক্ষ থেকে তার হৃদয়ে অপকর্মের প্ররোচনা সৃষ্টি হয়, ফলে সত্যের অস্বীকার করা হয় এবং পুণ্যকর্ম থেকে বিরত রাখা হয়। অতএব যার হৃদয়ে এমন প্রেরণা জন্মে তার উচিত হবে শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

এতক্ষণ আমি ফেরেশতার বাস্তবতা ও তাদের কাজ উল্লেখ করেছি। এই আলোচনা থেকে নিশ্চয় স্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকবে যে, ফেরেশতার অস্তিত্ব অযথা নয় বরং তাদের সাথে মানুষের এক বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি আর কোনো সাধারণ বিষয় রইল না যেমনটি সাধারণত মানুষ মনে করে থাকে বরং বোঝা গেল, ফেরেশতার অস্তিত্ব ও একটি অতি উপকারী জিনিস।

মানুষ কি ফেরেশতার কোনো উপকার সাধন করতে পারে?

এখন আমরা দেখব, মানুষ ফেরেশতার কোনো উপকার সাধন করতে পারে কি না। এ বিষয়ে যতদূর আমার গবেষণা রয়েছে তা থেকে বোঝা যায় এবং এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীস হতে আমার ব্যাখ্যা হলো, মানুষ ফেরেশতার অন্য কোনো উপকার সাধন করতে পারে না তবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে পারে। যেমন পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যখন ফেরেশতারা আসে এবং এসে সালাম দেয় তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাদের

উত্তর প্রদান করেন। যদি এই দোয়া সংবলিত উত্তরে ফেরেশতার কোনো উপকারই না হতো তাহলে তিনি সালামের জবাব দিতেন না। কেননা সালাম হলো শান্তি বা মর্যাদার উন্নতির দোয়া আর মর্যাদায় যার উন্নতি সম্ভব নয় তার জন্য দোয়া করা নিরর্থক। তেমনিভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছেন, জিবরাইল (আ.) তোমাকে আসসালামু আলাইকুম বলেছেন। এতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম। এক্ষেত্রে মহানবী (সা.) তাঁকে বারণ করেন নি। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদাব, বাবু রাদ্দিস সালাম)

একইভাবে তাশাহুদ অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সাহাবীরা (রা.) বলতেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সালাম, জিবরাইলের প্রতি সালাম এবং অমুক অমুকের প্রতি সালাম। এক্ষেত্রে মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সালাম দিতে বারণ করেন কিন্তু জিবরাইল (আ.)-এর প্রতি সালাম প্রেরণে বারণ করেন নি। জিবরাইল (আ.)-এর যদি কোনো উপকার না-ই হতো তাহলে তিনি (সা.) অবশ্যই সালাম দিতে নিষেধ করতেন। ফেরেশতার উপকার করার বিষয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু পাওয়া যায় না।

ফেরেশতার অস্তিত্বের প্রমাণ

ফেরেশতা যে বাস্তবিকই বিদ্যমান আছে এখন আমি তার প্রমাণ উপস্থাপন করব। প্রথম কথা হলো, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা আছে। এখন আমি দলিল-প্রমাণের নিরিখে সাব্যস্ত করছি যে, ফেরেশতা যে আছে তা কীভাবে বোঝা যায়?

- (১) আমরা দেখি, পুরো বিশ্বজগতে একটি নিয়ম, একটি শৃঙ্খলা কাজ করছে এবং এই নিয়ম এত স্পষ্ট ও শক্তিশালী যে, এটিকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না আর সেই নিয়ম একটি বিশেষ এক সচেতন ইচ্ছার অধীনে বা সঞ্চালকের অধীনে কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ- আমরা আকাশে নক্ষত্রের আবর্তন দেখি। এগুলোর মাঝে এমন প্রজ্ঞা পরিলক্ষিত হয় যে, এসবের ব্যবস্থাপনা কোনো সচেতন ইচ্ছা শক্তির অধীনস্থ না হলে পরিচালিত হবার কথা নয়। এরপর এই পৃথিবীকেই ধরুন যাতে বসতি স্থাপিত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এটিকে একটি সাধারণ গ্রহ প্রমাণ করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে আর তারা এটিকে একটি নগণ্য গ্রহ সাব্যস্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা বলে, এটি কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। আমাদের কথা হলো, এটি কেন কেন্দ্রে স্থান পেল?

প্রকৃত কথা হলো, যেহেতু মানবজাতি এতে বসবাস করে তাই সকল নক্ষত্রের এতে প্রভাব বিস্তার করা অবধারিত ছিল। আর এই গ্রহটি কেন্দ্রে থাকলে পরেই তা সম্ভব। এ থেকে বোঝা গেল, এটি এক সচেতন ইচ্ছার অধীনে সৃষ্টি করা হয়েছে এমনভাবেই বানানো হয় নি।

তেমনিভাবে অবশিষ্ট পুরো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। কয়েক বছর হলো, একটি বিশেষ নক্ষত্র দৃশ্যমান হয়েছিল যার সম্পর্কে মনে করা হয়েছিল যে, এটি পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খাবে আর পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু কিছুদিন পর সেটির গতিপথ বদলে যায় আর কিছুই হয় নি। কয়েকবার এমন হয়েছে আর প্রতিবারই এ ধারণাই করা হয়েছে যে, উল্কা পৃথিবীতে আঘাত হানলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এসব ধূমকেতু এমনই নিরেট ঘন হয়ে থাকে যে, এগুলো পৃথিবীতে আঘাত হানলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার কথা। কিন্তু এগুলো পৃথিবীর সাথে ধাক্কা লাগার কাছাকাছি পৌঁছাতেই নিজেদের পথ পরিবর্তন করে নেয়। অথচ আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, পুচ্ছবিশিষ্ট তারা যার পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খেলে কোনো ক্ষতি হতে পারে না সেগুলো পৃথিবীর কাছে এসে যায় আর এগুলোর পুচ্ছ বা অবশিষ্টাংশ পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে। কিন্তু এগুলো এমনই সূক্ষ্ম অণু দিয়ে গঠিত যে তা পৃথিবীর কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

একবার ইউরোপের বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছিল যে, এবার এক নক্ষত্র পৃথিবীর পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করবে যার ফলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। একথা শুনে বেশকিছু লোক তখন কত-না কষ্ট-যাতনা সহ্য করে মরতে হবে এ চিন্তা করে আত্মহত্যা করে মারা যায়। কিন্তু সেই ধূমকেতু আসে আর পাশ দিয়ে চলে যায় আর কোনো ক্ষতিই হয় নি। সেসময় জ্যোতির্বিদরা বলেছিল, এর অনুগুলো এতই সূক্ষ্ম ছিল যে, এটি সূর্যের সামনে আসতেই এর পুচ্ছ সূর্যের রশ্মির প্রভাবে স্বস্থান থেকে সরে ডানদিক থেকে বামদিকে চলে যায়।

এ ধরনের কথা থেকে বোঝা যায়, একটি সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল নিয়ম আছে যার অধীনে সকল কাজ হচ্ছে। যদি এক সচেতন সত্তা এসবের নেপথ্যে না থাকত তাহলে একাজ পরিচালিত হওয়া কীভাবে সম্ভব? এখন প্রশ্ন হলো, সেই সচেতন সত্তা কে? এর উত্তর আল্লাহ তা'লাই দিতে পারেন আর তিনি বলছেন, সেই সচেতন সত্তা হলো ফেরেশতা। অতএব প্রতিটি জিনিসের ওপর ফেরেশতার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তাদের মাধ্যমেই এই পুরো ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে।

প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর যে ফেরেশতার নিয়ন্ত্রণ কাজ করে এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। একবার আমার জ্বর হয়। চিকিৎসকরা ঔষধপত্র দেয়

কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। একদিন চৌধুরী জাফরুল্লাহ সাহেব আসলেন, তার সাথে একজন অআহমদী বন্ধুও ছিলেন। তাকে আমি আমার কাছে ডেকে নিলাম। তার আসার আগে আমার তন্দ্রা পায় এবং একটি মশা আমার সামনে এসে বলে যে, আজ জ্বর নেমে যাবে। ডাক্তার সাহেব, চৌধুরী সাহেব এবং সেই অআহমদী বন্ধু এছাড়াও অন্য কয়েকজন আহমদী আসলে আমি তাদেরকে এই দিব্যদর্শন বলে দিই। এর কিছুসময় পর ডাক্তার সাহেব থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, জ্বর নেই।

মূলত সেই মশা কোনো কথা বলে নি বরং সেই ফেরেশতা বলেছে যার ওপর এ-কার নিয়ন্ত্রণ ছিল। অতএব প্রতিটি জিনিস যা এক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করছে তা ফেরেশতার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

(২) দৈহিক গঠন থেকেও প্রমাণিত হয়, ফেরেশতা আছে কেননা আধুনিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে যে-সব জিনিস আমাদের চোখে পড়ে এগুলো মূলত এমন নয়। যেমন, আমরা যে মানুষ দেখি তা একটি জিনিস থেকে সৃষ্ট নয় বরং কোটি কোটি অণুর সম্মেলনে সৃষ্ট। শুধু তাই নয় সেসব অণু আবার কোটি কোটি সূক্ষ্ম পরমাণুর মাধ্যমে গঠিত। সেগুলো আবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুর সমষ্টি।

(৩) এমনকি আমেরিকার এক বিজ্ঞানী এমন পরমাণু আবিষ্কার করেছে যা মানবদেহে অতিক্রম করতে পারে। বাতাস দেহের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না কিন্তু সেই পরমাণু দেহের এক প্রান্তে ঢুকে অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

অতএব জাগতিক এই গবেষণার মাধ্যমেও প্রমাণিত যে, আমরা যে জিনিসই দেখি না কেন তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অস্তিত্ব রয়েছে এবং তা মূলত খুবই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুর সমষ্টি। প্রতিটি জিনিস যেহেতু দৃষ্টির আড়ালে থাকা এমন সব সূক্ষ্ম উৎসমূল থেকে নিজ শক্তি লাভ করে তাই প্রমাণ হলো, এই সূক্ষ্মতার দিকে ধাবিত হবার মাঝে কোনো প্রজ্ঞা কার্যকর আর তা হলো, সব জিনিসে ফেরেশতার ভূমিকা বিদ্যমান যা স্বয়ং খুবই সূক্ষ্ম।

মোটকথা বিশ্বের সব জিনিসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুর সাথে সম্পর্ক বলছে, এসবের ব্যবস্থাপক বা নিয়ন্তাও অতীব সূক্ষ্ম হবে। সব জিনিসের সূক্ষ্মতা প্রমাণ করছে যে, এসবের ওপর সূক্ষ্ম রূহ বা সূক্ষ্ম সৃষ্টি কাজ করছে আর সেগুলোই হলো ফেরেশতা।

(৪) নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যের মাধ্যমেও কোনো জিনিসের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, মানুষ যখন লন্ডন থেকে এসে বলে, লন্ডন একটি শহর, তখন মানুষ তার একথা বিশ্বাস করে নেয়। তেমনিভাবে ফেরেশতার অস্তিত্ব সম্পর্কে যখন এত নির্ভরযোগ্য মানুষ বলে আসছেন যে, ফেরেশতা আছে এক্ষেত্রে এদের কথা কেন গ্রহণ করা হবে না? যদি সাক্ষ্যের ওপর আস্থাই না রাখা যায় তাহলে লন্ডনও কেবল সেসব লোকের জন্য বিদ্যমান যারা সেটি দেখে এসেছেন। যারা দেখে আসেন নি তাদের কাছেও লন্ডনের কোনোরূপ অস্তিত্ব থাকাই উচিত নয়। কেউ বলতে পারে, লন্ডন তো সবাই গিয়ে দেখে আসতে পারে কিন্তু ফেরেশতাকে তো সবাই দেখতে পারে না! আমরা বলব এটি ভুল কথা যে লন্ডন প্রত্যেক ব্যক্তি দেখে আসতে পারে। লন্ডন সে ব্যক্তিই দেখে আসতে পারে যার কাছে টাকা আছে। তেমনিভাবে আমরা বলতে পারি, ফেরেশতাকে দেখার মতো যাদের যোগ্যতা থাকে তারা ফেরেশতাকেও দেখতে পায়।

(৫) কেউ যদি টাকা জমিয়ে লন্ডন দেখে আসতে পারে তাহলে ফেরেশতাকে দেখার শক্তি অর্জন করে ফেরেশতাকেও দেখা সম্ভব।

মোটকথা, ফেরেশতা সম্পর্কে শতসহস্র মানুষের যে সাক্ষ্য পাওয়া যায় তা-ও ফেরেশতার অস্তিত্বের প্রমাণ।

চতুর্থ প্রমাণ হলো, সেটি যার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। প্রতিদিন না হলেও কিছু দিন পর পর প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়। বহুবার তার মনে এমন কোনো কথা প্রভাব ফেলে যার সাথে তার চিন্তাধারার কোনো দূরতম সম্পর্কও থাকে না। বরং কখনো কখনো তার চিন্তাধারার বিপরীত ধ্যানধারণার উদ্বেক হয় আর তা করতে মানুষ এমনভাবে বাধ্য হয় যে, মানুষ তা ছাড়তেই পারে না। প্রতিটি মানুষের জীবনে কখনো না কখনো এমন সময় অবশ্যই আসে এমনকি কাফেরদের জীবনেও এসে থাকে। নাস্তিকদের জীবনেও আসে। অনেক নাস্তিকের এমনসব ঘটনা লিপিবদ্ধও আছে। যেমন- তারা বলে, আমাদের হৃদয়ে এমন প্রেরণার উদ্বেক হয়েছে যা বাধ্য করে কোনো এক জায়গায় নিয়ে গেছে এবং সেখানে দেখে যে, মৃতদেহ পড়ে আছে। এমন প্রেরণার উদ্বেককারী কে? উত্তর হলো, ফেরেশতা।

অতএব এ ধরনের সাক্ষ্য বস্তুবাদী লোকদের মাঝেও পাওয়া যায়। আর আধ্যাত্মিক মানুষের মাঝে তো এমন সাক্ষ্য ভূরি ভূরি রয়েছে। যেমন- হঠাৎ মনে

এক প্রেরণা জাগে যার সাথে চিন্তাধারার কোনো সম্পর্ক থাকে না অথচ তাতে আমল করতে হয়। এ প্রেরণা ফেরেশতার পক্ষ থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে আর এটি তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ।

ফেরেশতার প্রয়োজনীয়তা

এতক্ষণ আমি ফেরেশতার অস্তিত্বের যৌক্তিক কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। এখন আমি ফেরেশতার প্রয়োজনীয়তা কী- তা তুলে ধরছি। কোনো জিনিসের প্রয়োজনীয়তাও সে জিনিসের বিদ্যমানতার প্রমাণ হয়ে থাকে, কেননা যদি কোনো জিনিসের প্রয়োজন প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিশদ অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, এমন জিনিসের অস্তিত্বও অবশ্যই থাকে। অতএব কোনো জিনিসের প্রয়োজনীয়তাও তার অস্তিত্বের প্রমাণ। কিন্তু এই প্রমাণ পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নয়, তাই আমি ফেরেশতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছি।

প্রথম প্রয়োজন হলো, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ব্যবস্থায় সাদৃশ্য থাকে আর সাদৃশ্য থাকাও উচিত। আধ্যাত্মিক বিষয়াদিকে জাগতিক বিষয়ের মাপকাঠিতে অনুমান করা হয়ে থাকে, কেননা এ উভয় ধারা সমান্তরালে চলে। তবে সেসব ক্ষেত্রে ব্যতীত যেখানে একভাবে বা সমান্তরালে চলার প্রয়োজন নেই। জাগতিক বিষয়াদিতে আমরা দেখি, উপকরণের এক সুবিস্তৃত ধারা বা শৃঙ্খল রয়েছে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপকরণ পর্যন্ত এ ধারা চলমান রয়েছে, এমনকি অতিশয় সূক্ষ্ম গ্যাস পর্যন্ত গিয়ে তা উপনীত হয় বরং বলা হয়, এরও অধিক গভীরে গিয়ে বস্তুগত শক্তিতে রূপান্তরিত হয় আর এই শক্তিসমূহের উৎসগুলোর নাম আমরা ফেরেশতা বলে থাকি।

মোটকথা, বস্তুজগতের বিভিন্ন সৃষ্টির ধারা বা শৃঙ্খল এমন যে, সূক্ষ্ম হতে হতে তা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় আর এটিকে দেখার আর কোনো উপায় থাকে না। আধ্যাত্মিক ধারা বা শৃঙ্খলের জন্য ঠিক অনুরূপ রীতি থাকা আবশ্যিক এবং তা রয়েছেও বটে। আর এই শৃঙ্খলের শেষ কড়া হলো ফেরেশতা। একথা বলা যে, আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতে কার্যকারণ বা মাধ্যম থাকে না কেবল জাগতিক বিষয়াদিতে থাকে- একথা ভুল। জাগতিক বিষয়াদির বিষয়ে এক দার্শনিক একথাও লিখেছেন যে, কোনোকিছু এমনিতেই হয় না বরং প্রত্যেকটি জিনিসের কারণ বা মাধ্যমের বিষয়টি অতি দীর্ঘ। অতএব যখন দৈহিক ক্ষেত্রে কোনো জিনিস উপকরণের শৃঙ্খল বা ক্রমধারা ছাড়া হতে পারে না সেক্ষেত্রে কেবল কি আধ্যাত্মিক বিষয়ই এমন যে,

সেখানে উপকরণের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মানার দরকার নেই? যেখানে দৈহিক বিষয়াদি ক্রমধারায় কাজ করে সেখানে সাদৃশ্যের জন্য আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতেও সেভাবে চলা আবশ্যিক আর আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলের শেষ কড়া হলো ফেরেশতা। অতএব আধ্যাত্মিকতার জন্য ফেরেশতার আবশ্যিকতা রয়েছে।

(২) আমরা সব কিছুই মাঝেই বিবর্তন দেখতে পাই আর এই বিবর্তনের বিষয়টি সর্বজনীন দেখে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বর্তমানে মানুষ যেমন আছে, সূচনাতে তেমন ছিল না। শুরুতে মানুষ কীটের অবস্থায় ছিল। এরপর উন্নতি করে এটি বড়ো হয়েছে, তারপর আরো বড়ো হয়েছে এবং অবশেষে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিবর্তনের এমন মতবাদ ভুল মনে হয় এবং অনেকভাবে এটি খণ্ডন করা যেতে পারে। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ করলে এটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, পরস্পরের ভিন্ন বা পৃথক অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তন, বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরের মুখাপেক্ষী অথবা মাধ্যমের মুখাপেক্ষী। হঠাৎ করে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার দিকে ধাবিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। অতএব একদিকে মানবের মাঝে মহান থেকে মহানতর উন্নতি করার বাসনা এবং খোদা তা'লার সাক্ষাৎ লাভের একাগ্র ব্যাকুলতা থাকা আর অন্যদিকে তার বর্তমান কলুষ তার (তথা আল্লাহর) সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়া—এ দুটি বিষয় আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, মানুষ এবং খোদা তা'লার মাঝে আরেকটি মাধ্যম থাকা আবশ্যিক যা একদিকে সৃষ্টিও হবে আর অপরদিকে হবে পুণ্যবান এবং আধ্যাত্মিকও হবে। এই মাধ্যমকে বলা হয় ফেরেশতা।

কথিত আছে, এক ব্যক্তি কোনো উঁচু মিনারে আরোহণ করল ঠিকই কিন্তু নামতে পারছিল না। কেউ একজন তিরের সাথে সূক্ষ্ম তারের রোল বেঁধে তির তার দিকে নিক্ষেপ করল আর সেই ব্যক্তি তা ধরে ফেলল। সেই সূক্ষ্ম সুতা সে নীচে বুলিয়ে দিল আর নীচে যে ছিল সে এর সাথে মোটা সুতা বেধে দিল এবং ওপরের ব্যক্তি তা কিছুটা ওপরে টানল এরপর এর সাথে আরো মোটা সুতা বেধে দিল এভাবে একটি শিকল বাঁধা হয়ে গেল এবং সেই ব্যক্তি এর মাধ্যমে নীচে নেমে এলো।

একিভাবে ফেরেশতার মাধ্যমে খোদার সাথে বান্দার সম্পর্ক হয়। তারা (তথা ফেরেশতারা) মধ্যবর্তী কড়া যার মাধ্যমে খোদার সাথে বান্দার সম্পর্ক হয় আর সে তার কল্যাণসমূহ নিজের মাঝে আকর্ষণ করে থাকে। অতএব খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য ফেরেশতার অস্তিত্ব আবশ্যিক।

ফেরেশতার তৃতীয় আবশ্যিকতা যা জানা যায় তা হলো, আমরা বাহ্যিক জগতে দেখি যে, দৈহিক লালনপালনের জন্য দুটি ধারা রয়েছে। একটি সেটি যা কোনো মানুষের অজান্তে এবং তার কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করছে। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন:

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ
(আন-নাহল: ১৩) مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهُ

অর্থাৎ খোদার নির্দেশের অধীনে রাত এবং দিন, সূর্য এবং চন্দ্র আর নক্ষত্র তোমাদের কোনো পরিশ্রম ছাড়াই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত।

আরবী মুসাখ্খার শব্দের অর্থ হলো, যার পেছনে কোনোকিছু ব্যয় করতে হয় না অথচ সে কাজ দিয়ে থাকে। খোদা তা'লা বলেন, আমরা রাত এবং দিন, সূর্য এবং চন্দ্র আর নক্ষত্র তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছি। এর জন্য তোমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। রাত আসে দিন হয় কিন্তু তোমরা এর জন্য কোনো পরিশ্রম করো না আর এর জন্য তোমাদের কোনো ব্যয়ও হয় না। এমনভাবে সূর্য রোদ দেয়, চাঁদ আলো দেয়, নক্ষত্র বিভিন্ন প্রকার প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু এর জন্য তোমাদের কিছুই করতে হয় না। এই ব্যবস্থা যদিকে আল্লাহ তা'লা ইঙ্গিত করেছেন তা এ সাক্ষ্য দেয় যে, খোদা তা'লা এমন একটি ব্যবস্থাপনা আমাদের কল্যাণার্থে রেখেছেন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। এর মাঝে আমাদের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। যেমন সূর্যের কিরণের মাঝে এমন শক্তি রয়েছে, পানিকে বিভিন্ন রঙের কাঁচে ঢেলে যদি এর সামনে রেখে দেওয়া যায় তাহলে এর মাঝে এমন শক্তি সৃষ্টি হবে যে, এর দ্বারা অনেক রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। একিভাবে চাঁদের আলোতে কতক সবজি বড়ো হয় এবং পরিপক্বও হয়। আমি নিজে শসা বড়ো হবার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি যে, চাঁদনি রাতে তা এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, এটি বড়ো হওয়ায় সরসর শব্দ কানে আসে। আরো অনেক এমন উদ্ভিদ আছে যেগুলো চাঁদের আলোয় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। আমি তো কেবল দু'একটি উদাহরণ দিয়েছি। এসব জিনিসের সহশ্র সহশ্র প্রভাব রয়েছে যার কিছু আমাদের জানা আছে কিন্তু যা অজানা তা যে সংখ্যায় কত হবে তা আমাদের জানা নেই।

অতএব এই চাঁদ, সূর্য এবং নক্ষত্র সকলে প্রভাব বিস্তার করছে আর বর্তমানে গবেষণায় দেখা গেছে, সূর্য থেকে আগত রোদ যক্ষ্মার জীবাণু বিনাশকারী তাই রোদকেও চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রেখে দেখো যে, সূর্য কীভাবে মানুষের সেবা করে চলেছে। এক ব্যক্তি যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে গেলে

তার মাঝেও যক্ষ্মার জীবাণু প্রবেশ করে তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে কিন্তু কড়া রোদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলে তার শরীরের সেই জীবাণু নিজে নিজেই মরে যায় অথচ সে জানতেও পারে না এবং এভাবে সে রক্ষা পায়।

অতএব এই মানুষের কোনোরূপ পরিশ্রম বা চেষ্টাপ্রচেষ্টা ছাড়াই এ ব্যবস্থাপনা মানুষের উপকারার্থে কাজ করে চলেছে। আর অপর ব্যবস্থাপনাটি হলো, যেখানে মানুষ নিজের পরিশ্রম এবং চেষ্টাপ্রচেষ্টার মাধ্যমে কোনোকিছু থেকে কল্যাণ লাভ করে এবং নিজের জন্য উপকারী বানিয়ে নেয়। যেভাবে শস্য থেকে রুটি প্রস্তুত করা, মাটি থেকে বাড়ি নির্মাণ করা, লোহা এবং কাঠ দ্বারা একা গাড়ি তৈরি করা, রেল তৈরি করা, জ্ঞান অর্জন করা। এখানে ভাবার বিষয় হলো, এটি কি সম্ভব যে, মানুষের جسمانی تربیت اور انتظام کے لئے দুটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত আছে কিন্তু আধ্যাত্মিকতার জন্য আল্লাহ তা'লা কোনো ব্যবস্থা করেন নি? এদিকে আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক ব্যবস্থাপনার সাদৃশ্য বলে যে, যেভাবে চাঁদ, সূর্য এবং নক্ষত্রের প্রভাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের দৈহিক ব্যবস্থাপনার ওপর পড়ছে এবং কল্যাণ দিচ্ছে, ঠিক সেভাবে আধ্যাত্মিকতার জন্যও কোনো ব্যবস্থাপনা বানানো আবশ্যিক যা দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিকতায় কল্যাণ পৌঁছে। এজন্যই আল্লাহ তা'লা ফেরেশতাদের রেখেছেন যারা মানুষের মাঝে আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি করে এবং তাদের সুরক্ষা করতে থাকে। তবে হ্যাঁ, যখন অসুস্থতা বেড়ে যায় তখন সূর্যের কিরণ যেভাবে যক্ষ্মার জীবাণুকে মারতে পারে না বরং ঔষধ খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়, ঠিক সেভাবে যখন আধ্যাত্মিক অসুস্থতা বেড়ে যায় তখন তার জন্যও অন্যান্য উপকরণের প্রয়োজন পড়ে। এই হলো ফেরেশতা থাকার আবশ্যিকতা।

ফেরেশতার বিষয়ে যে-সব আপত্তি করা হয় এখন আমি সেগুলোর জবাব দিচ্ছি

প্রথম আপত্তি করা হয়, ফেরেশতা যদি থেকেই থাকে তাহলে আমরা কেন তা দেখতে পাই না? এটি এমন এক আপত্তি যা শুনে হাসি পায়, কেননা জগতে এমন হাজারো জিনিস আছে যা দেখা যায় না কিন্তু মানুষ তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আমি বলি, মিষ্টি কেউ চোখে দেখেছে? এ বিষয়ে এটিই বলা হবে যে, এটি তো জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত বিষয় তাই দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি যদি জানতে চাই, আওয়াজ কারও দৃষ্টিগোচর হয়? বলা হবে, এর সম্পর্ক কানের সাথে। আমি আবার বলব, কোমল বা কঠোর কেউ দেখে কি? তখন বলা হবে, এটি তো স্পর্শের সাথে সম্পর্ক

রাখে। আমি আবার বলব, সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ কেউ দেখতে পায়? বলা হবে যে, এ তো নাক বা ঘ্রাণের সাথে সম্পর্ক রাখে। এসব উত্তর থেকে বোধগম্য হয় যে, কোনো জিনিসের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার জন্য সর্বদা দেখা যাওয়া আবশ্যিক নয় বরং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও আছে যা দ্বারা সেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। এরপর আমি জানতে চাই, বাতাস কেউ দেখেছে? যখন বাতাস প্রবাহিত হয় তখন উপলব্ধি হয় যে, বাতাস আন্দোলিত করছে অন্যথায় তা দেখা যায় না। এমনইভাবে আরো অনেক শক্তিনিচয় রয়েছে। যেমন— স্মৃতিশক্তি। কে আছে যে সেটি আন্দান করে অথবা ঘ্রাণ নিয়ে বা দেখে বিশ্বাস করে? এর প্রভাব বা কার্যকারিতার কারণেই এর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপিত হয়। অতএব সাব্যস্ত হলো, এমন জিনিসও আছে যেগুলো না দেখেই বরং অন্য লক্ষণ বা উপসর্গ দ্বারা বিশ্বাস করা হয় আর সেগুলোর প্রভাব দেখে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। এমনইভাবে প্রভাবের মাধ্যমে ফেরেশতাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যেতে পারে, তা দৃশ্যমান হওয়া আবশ্যিক নয়। এর প্রভাব দ্বারা এদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় আপত্তি এমন যেটি সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি জ্ঞানীদের আপত্তি এবং এটিকে খুবই যৌক্তিক আখ্যা দেওয়া হয় কিন্তু আমি বলি, এটি এমন অজ্ঞতাপূর্ণ আপত্তি যে, এর চেয়ে বড়ো অজ্ঞতা আর হতে পারে না। সেই আপত্তিটি হলো, আল্লাহ্ কি ফেরেশতার মুখাপেক্ষী? তা না হলে তিনি এদেরকে কেন বানিয়েছেন? আমরা বলি, খোদা হলেন ফেরেশতার সৃষ্টিকর্তা আর কোনো জিনিসের সৃষ্টিকর্তা সেই জিনিসের মুখাপেক্ষী হয় না। খোদা তা'লাকে ফেরেশতার মুখাপেক্ষী তখন বলা যেত, যদি তিনি ফেরেশতাদের অন্য কোনো জায়গা থেকে নিয়ে আসতেন। অথচ স্বয়ং খোদাই তো ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। তাহলে তিনি এদের মুখাপেক্ষী কীভাবে হন? ‘ইহতিয়াজ ইলাল গায়র’ হয়ে থাকে অর্থাৎ মুখাপেক্ষিতা অন্যের বা পরজনের প্রতি হয়ে থাকে নিজের স্বত্বভুক্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন কোনোকিছুর কেউ মুখাপেক্ষী হয় না। যেহেতু খোদা তা'লা স্বয়ং ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি এদের মুখাপেক্ষী নন। অতএব এটি অজ্ঞতাপ্রসূত এক আপত্তি।

দ্বিতীয়ত এই আপত্তি এভাবেও খণ্ডিত হয়, পার্থিব জগতেও আমরা দেখি যে, সবকিছুরই একটা কারণ থাকে। সেসকল লোক যারা বলে যে, ফেরেশতায় বিশ্বাস স্থাপন করার ফলে খোদা ফেরেশতার মুখাপেক্ষী- একথা বিশ্বাস করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তারা স্বীকার করে যে, খাবারের দ্বারা উদরপূর্তি হওয়া খোদার বিধান। আমি জানতে চাই, খাবার দ্বারা উদর পূর্তি করার বিধান বানিয়ে খোদা কি এ বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে গেছেন যে, তাঁকে খাবার দিয়েই বান্দার পেট ভরতে হবে?

এমনইভাবে রোগবালাই রয়েছে যার নিরাময়ের ব্যবস্থা খোদা ঔষধের মাধ্যমে করেছেন। প্রশ্ন হলো, খোদা কি ঔষধের মুখাপেক্ষী হয়ে গেছেন? এমনিভাবে আলোর জন্য খোদা তা'লা সূর্য সৃষ্টি করেছেন। খোদা কি সূর্যের মুখাপেক্ষী হয়ে গেছেন? দৈহিক ব্যবস্থাপনায় উপকরণ নির্ধারণ করার কারণে তো তিনি মুখাপেক্ষী হন নি তাহলে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনায় ফেরেশতাকে উপকরণ নির্ধারণ করার কারণে কেন তিনি মুখাপেক্ষী হবেন?

এই আপত্তির তৃতীয় খণ্ডন এভাবেও হতে পারে যে, সেই উপকরণই জগতে দুর্বলতা প্রকাশ করে যেই উপকরণ ছাড়া কেউ কোনো কাজ করতে সক্ষম নয়। সেই উপকরণ দুর্বলতার কারণ হয় না যা নিজ করায়ত্তে থাকে। যেমন— কেউ কারো প্রতি অসম্মত এবং তার সাথে কথা বলে না। কিন্তু অন্য কাউকে সে বলল, অমুক ব্যক্তি যেন এখানে না আসে। তবে কি সে বলবে যে, এ ব্যক্তি বোবা? আমার সাথে কথা বলে নি তাই বোবা! একথা বলতেই পারে না। এই আপত্তি অবাস্তব হবে কেননা সে অন্যদের সাথে ঠিকই কথা বলে। অনুরূপভাবে আমরা দেখি যে, খোদা তা'লা ফেরেশতাদেরকে বিনা উপকরণে সৃষ্টি করেছেন, তাইতো? যদি তাদেরকে এরূপে সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে বোঝা গেল যে, কোনো উপকরণ ছাড়াও খোদা কাজ করতে পারেন কিন্তু ফেরেশতাকে তিনি কোনো প্রজ্ঞার ভিত্তিতে কারণ নির্ধারণ করেছেন। অতএব ফেরেশতার সৃষ্টি যেক্ষেত্রে এমন যে, বিনা উপকরণে খোদা তা করেছেন, সেক্ষেত্রে বোঝা গেল যে, তাদেরকে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে কোনো প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই কিন্তু খোদা তাদের মুখাপেক্ষী নন এবং তাদের ছাড়া তাঁর চলে না- এমনটিও নয়।

এর চতুর্থ উত্তর হলো, তোমরা ফেরেশতার নিযুক্তিকে মুখাপেক্ষিতা বলে থাকো আর আমরা বলি হিকমত (বা প্রজ্ঞা) আর ফেরেশতা নিযুক্ত করার হিকমত হলো, জ্ঞানের বিস্তৃতি জ্ঞানের অজানা দিকগুলোর কারণে এবং সেগুলোর সংখ্যাধিক্যের ফলে হয়ে থাকে। যেমন— কুইনাইনে যে গুণাগুণ আছে, যদি তা অপ্রকাশিত না থাকত তাহলে এ বিষয়ে বিজ্ঞান যে উন্নতি সাধন করেছে, তা সম্ভব হতো না।

অতএব জ্ঞানের বিস্তৃতির জন্য অজ্ঞাত উপকরণ আবশ্যিক। উপকরণ যদি অজানা না থাকে তা হলে বিস্তার লাভ করতে পারে না, কেননা যে বিষয় প্রকাশ্য তাতে বিস্তৃতি কীভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে? অতএব জ্ঞানের বিস্তৃতির জন্য খোদা তা'লা গোপন উপকরণ রেখেছেন। যতই সেগুলো আবিস্কৃত হতে থাকে ততই জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে আর সেগুলোর আবিস্কারের প্রচেষ্টায় যে যত বেশি পরিশ্রম করে, সে তত বেশি জ্ঞান লাভবান করে এবং সুখ্যাতি অর্জন করে।

এমনিতেই যদি জ্বর ভালো হয়ে যেত তাহলে সেই ডাক্তার যে কিনা এর উপসর্গ নিয়ে গভীর অভিনিবেশের একপর্যায়ে এর প্রতিষেধক হিসেবে কুইনাইন উদ্ভাবন করেছে তার মাঝে এবং সাধারণ লোকের মাঝে কী পার্থক্য থাকত? এছাড়া জ্ঞানের এক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হচ্ছে তা কীভাবে হত? অতএব জগতে উন্নতি এবং অগ্রগতি লাভ করার জন্য অপ্রকাশিত উপকরণ অনেক বড়ো মাধ্যম। এটি না থাকলে কেউ উন্নতি সাধন করতে পারত না আর উন্নত পদমর্যাদাও লাভ করতে পারত না।

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য আর এ কারণে আধ্যাত্মিক উপকরণও অপ্রকাশিত রাখা হয়েছে। যে এগুলোকে কাজে লাগায় সে পুরস্কার পায় এবং উন্নত পদমর্যাদা লাভ করে। অতএব উন্নতির জন্য গোপনীয়তার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তাই এ কথা বলা ভুল যে, যদি গোপন উপকরণাদির কথা স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে খোদাকে এগুলোর মুখাপেক্ষী আখ্যা দেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়বে। না দেখা উপকরণের বিদ্যমান থাকা খোদা তা'লার মুখাপেক্ষিতা সাব্যস্ত করে না বরং বান্দার মুখাপেক্ষিতা সাব্যস্ত করে যেন বান্দা সেসবের মাধ্যমে উন্নতি সাধন করে। খোদা তা'লা যদি এই বিধান নির্ধারণ করে থাকেন যে, ভূমিকে যদি এক নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত খনন করা হয় তাহলে ভালো ফলন হবে, এটি এ কারণে নয় যে, খোদা এর মুখাপেক্ষী বরং এর উদ্দেশ্য হলো, কৃষকদের মাঝে যে বড়ো কৃষক হতে চায় এবং ভালো ফসল উৎপাদন করতে চায়, সে এর মুখাপেক্ষী। যদি ভূমির উৎকৃষ্টমানের ফল উৎপাদন কোনো পরিশ্রম বা জ্ঞানের মুখাপেক্ষী না হতো তাহলে কোনো কৃষকের অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হতো না আর প্রতিযোগিতার যে প্রেরণা এ সময় কার্যকর রয়েছে তা একেবারেই হারিয়ে যেত। দ্বিতীয়ত এ কথাও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, যদি প্রচ্ছন্ন উপকরণ না থাকত তাহলে খোদা তা'লার প্রতাপ মানুষের ওপর প্রকাশিত হতো না এবং তাঁর শক্তিমত্তার তারা মূল্যায়ন করত না। যদি সব বিষয় পূর্ব থেকেই জানা থাকত তাহলে খোদা তা'লার প্রতাপ কীভাবে বান্দার ওপর প্রকাশিত হতো? কোনো বিষয়ে মানুষ যতই গবেষণা ও অনুসন্ধান করে ততই সে বিষয়ে নতুন নতুন বিষয়াদি আবিষ্কার করে থাকে আর এভাবে খোদা তা'লার শক্তিমত্তার কথা মানতে সে বাধ্য হয়। অতএব প্রচ্ছন্ন উপকরণ সৃষ্টি করা খোদা তা'লার মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে না বরং এটি বান্দার সংশোধন এবং কল্যাণের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

প্রচ্ছন্ন ও অপ্রকাশিত উপকরণ আবিষ্কারের ফলে পদমর্যাদা এবং উন্নতি ও সম্মান লাভ হতে পারে আর এসবের শেষ শৃঙ্খল বা কড়া হলো ফেরেশতা। মহানবী

(সা.)-এর প্রতি এই উপকরণ এত ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তাঁর (সা.) যে উন্নতি এবং পদমর্যাদা লাভ হয়েছে তা আর কারো অর্জিত হয় নি। এমনিভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এই উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনিও উচ্চসম্মান এবং উচ্চমর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর (আ.) মাধ্যমে আমার প্রতিও এই উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে আর আমাকেও খোদা তা'লা সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। (উপকরণ বা কারণ গোপন না থাকলে) পদমর্যাদার এই পার্থক্যও থাকত না বরং সবাই সমান হতো। কিন্তু অজ্ঞাত উপকরণের কারণে যত বেশি উপকরণ কারো জন্য প্রকাশিত হয়েছে, তদনুযায়ী তার পদমর্যাদাও লাভ হয়েছে।

এ বিষয়ে সন্দেহের কী অবকাশ আছে যে, সাধারণত কার্যকারণ প্রকাশিত থাকে কিন্তু কারণ থাকে অপ্রকাশিত। আর অপ্রকাশিত বিষয় উদ্ঘাটন করতে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এতে পুণ্য লাভ হয়, জ্ঞানে সমৃদ্ধি ঘটে এবং অগ্রহ বৃদ্ধি পায়। অতএব আধ্যাত্মিক গুণ উপকরণও আবশ্যিক ছিল যেন মানুষের অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানও বৃদ্ধি পায় আর চেষ্টাপ্রচেষ্টার মাঝেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আধ্যাত্মিক ব্যক্তি যেন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে এবং প্রতিযোগিতার সুযোগ লাভ হয়। প্রচ্ছন্ন হতে প্রচ্ছন্নতর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তার বিশ্বাস উন্নতি করে তার মনোবল দৃঢ় হয় আর খোদা তা'লার অসীম শক্তি তার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ তা'লা নিজ সত্তাকে গোপনকারী ব্যবস্থাপনাকে অসাধারণ বানাবেন আর তাঁর সত্তাকে প্রকাশকারী ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ করে দেবেন— এটি কীভাবে সম্ভব? অতএব উপকরণের মুখাপেক্ষী হবার প্রশ্নই ওঠে না।

তৃতীয়ত যে আপত্তি করা হয় তা হলো, পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসের একটা কারণ আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু ফেরেশতাই সে কারণের জন্য দায়ী তা আমরা কীভাবে মানতে পারি? যেমন ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হলে সে বিষয়ে আমাদের জানা থাকে যে, বায়ুমণ্ডলে কতক বিশেষ ধরনের পরিবর্তন হলে এমন ঝড় হয় অথবা বৃষ্টি হয়। আমরা জানি যে, সূর্যের মাধ্যমে জলীয়বাষ্প সৃষ্টি হয় এবং তা-ই বর্ষিত হয়। তাহলে এই বৃষ্টি বর্ষণ ফেরেশতার দ্বারা হয়— এটি কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য? এটি অজ্ঞতাপ্রসূত কথা এবং সে যুগের কথা যখন বলা হতো যে, ফেরেশতা সমুদ্র থেকে পানি পান করে আসে এবং এসে বৃষ্টি বর্ষণ করে। এ ধরনের কথা বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে কে বিশ্বাস করবে?

এ ধরনের আপত্তি উত্থাপনকারীরা ফেরেশতার বিষয়ে সঠিক বিশ্বাসের বিষয়টি বুঝেই না। আমরা একথা বলি না যে, বৃষ্টি বর্ষণের নিকটতর কারণ হলো ফেরেশতা আর ফেরেশতাই পানি এনে বৃষ্টি বর্ষণ করে বরং আমরা বলি, উক্ত বাষ্প সৃষ্টিকারী হলো ফেরেশতা যা বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। আমরা তো বলি, শেষ কারণ হলো ফেরেশতা। অন্য কোনো কারণ নেই তা আমরা বলি না। প্রত্যেক জিনিসের মাধ্যম রয়েছে কিন্তু সকল মাধ্যমের শেষে ফেরেশতা কার্যকর রয়েছে। একথা সত্য যে, বিভিন্ন বিবর্তন মাধ্যমের অধীনেই হয়ে থাকে আর এক মাধ্যমের পশ্চাতে দ্বিতীয়টি কার্যকর আর দ্বিতীয়টির পশ্চাতে তৃতীয়টি, এমনকি হাজার হাজার মাধ্যম থেকে থাকবে যেগুলোর বিষয়ে জগদ্বাসী অনবহিত। কিন্তু সবগুলোর শেষপ্রান্তে হবে ফেরেশতা। মাবের মাধ্যম কোটি কোটিও হতে পারে এবং আমরা তা অস্বীকার করছি না কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হলো, সবার শেষে রয়েছে ফেরেশতা।

চতুর্থত যে আপত্তি করা হয় তা হলো, যে-সব পরিবর্তন ঘটে থাকে তা নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনেই হয়ে থাকে। যেমন— কারো যদি জ্বর হয় আর জ্বর সৃষ্টিকারী যদি ফেরেশতা হয় তাহলে কুইনাইন প্রয়োগের ফলে জ্বর কেন নেমে যায়? এছাড়া চিকিৎসার মাধ্যমে যেক্ষেত্রে রোগ দূর হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ফেরেশতা জ্বর সৃষ্টি করে— একথা কীভাবে বিশ্বাস করা যায়? এমনিভাবে ফেরেশতা যদি কাশি সৃষ্টি করে থাকে তাহলে ঔষধ প্রয়োগের ফলে কেন তা দূরীভূত হয়? তখন কি ফেরেশতা পলায়ন করে?

এটিও অজ্ঞতাসুলভ এক আপত্তি কেননা আমরা একথা বলি না যে, ফেরেশতা কোনো সর্বশক্তিমান সত্তা বরং আমরা বলি, ফেরেশতা বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। যখন কোনো ব্যক্তি সেসব জিনিস ব্যবহার করে যার কারণে জ্বর ওঠে তখন যে ফেরেশতা সেসব জিনিসের বৈশিষ্ট্যাবলি প্রকাশের প্রারম্ভিক কারণগুলোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তারা সেসবের ফলাফলস্বরূপ জ্বর সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষ যখন সেসব জিনিস ব্যবহার করে যেগুলোর বৈশিষ্ট্য গুণ্ড থেকে গুণ্ডতর কারণগুলোর কল্যাণে জ্বর নামানোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন সেসব জিনিসের জন্য সর্বশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা নিজ প্রভাব প্রকাশ করা আরম্ভ করে দেয় আর প্রথম ফেরেশতা নির্ধারিত বিধানের কারণে নিজ প্রভাব প্রত্যাহার করা শুরু করে দেয়।

অতএব এটি বলা ঠিক হবে না যে, ঔষধের মাধ্যমে রোগের প্রভাব বিস্তারকারী ফেরেশতা চলে যায় বরং আসল বিষয় হচ্ছে, ঔষধের (অর্থাৎ রোগ নিরাময়কারী) ফেরেশতার প্রভাব যখন প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে তখন রোগের উপসর্গ প্রকাশকারী ফেরেশতা উপসর্গ দূরীভূত করতে থাকে।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ কেন দেওয়া হয়েছে?

এখন আমি এ বিষয় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতে চাই যে, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ কেন দেওয়া হয়েছে? ধরে নিলাম যে, ফেরেশতা ভালো জিনিস আর তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিসের কার্যকারিতা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কুইনাইনও তো উপকারী জিনিস, এর মাধ্যমে জ্বর নেমে যায় (তাহলে) এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ কেন দেওয়া হলো না? অনুরূপভাবে তোমরা বলে থাক, ফেরেশতা বৃষ্টি বর্ষণ করে কিন্তু সূর্যও তো বারি বর্ষণের কারণ হয়ে থাকে (তাহলে) এর প্রতি ঈমান আনার কেন নির্দেশ দেওয়া হয় নি? (শুধু) ফেরেশতার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ কেন দেওয়া হলো?

এ সম্পর্কে প্রণিধানের জন্য আসুন এটি জেনে নিই যে, নবী-রসূল এবং ঐশী গ্রন্থাবলির প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ কেন দেওয়া হয়েছে? এটি জানা গেলে আমরা সেই মূল বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারব যে-কারণে কোনো বস্তুর প্রতি প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়, এটিই (অর্থাৎ এ মূলটি) ফেরেশতাদের সম্পর্কে প্রয়োগ করে দেখবো। প্রকৃত বিষয় হলো, সেই সত্তা যাঁর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক তিনি কেবল আল্লাহ তা'লাই। নবী-রসূল এবং (ঐশী) গ্রন্থাবলি (হলো) সেসব বিষয় যাঁর মাধ্যমে খোদার প্রতি ঈমান আনা হয়। নতুবা প্রকৃতপক্ষে সেগুলো মূল উদ্দেশ্য নয়। ঐশী গ্রন্থাবলির প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়ার কারণ হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় মেলে আর খোদা তা'লার সাথে সাক্ষাৎ হয়। যেহেতু তা খোদার বাণী হয়ে থাকে (তাই) এর মাধ্যমে খোদার সত্তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে রসূলদের প্রতি ঈমান আনার কারণ হলো, রসূল নিদর্শনাবলির মাধ্যমে খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে থাকেন। তাই রসূলের প্রতি ঈমান আনায়ন তাঁর নিজের জন্য নয় বরং এর কারণ হলো, রসূল খোদার প্রতি ঈমান আনার মাধ্যম হয়ে থাকেন। অতএব রসূলদের প্রতি, (ঐশী) গ্রন্থাবলি ও কেয়ামতের প্রতি ঈমান আনা মূলত খোদা তা'লার প্রতি ঈমান আনার মাধ্যম হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'লা ছাড়া আরো পাঁচটি বিষয় রয়েছে যে-সবের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক:

১. ফেরেশতার ২. (ঐশী) গ্রন্থাবলি ৩. রসূলগণ ৪. তকদীর ৫. কেয়ামত

এগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা মূলত খোদার সত্তার প্রতি ঈমান আনার নামাস্তুর, কেননা এগুলো খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যম। ফেরেশতাদের সম্পর্কে তো এখন আলোচনা হচ্ছেই, অন্যান্য যত বিষয় রয়েছে সেগুলো দেখো! এগুলোর প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্যই হলো, এগুলো খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগের কারণ। এই মূলনীতি অনুসারে আমরা বলি যে, ফেরেশতাদের মাধ্যমেও যদি খোদা তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তাহলে তাদের প্রতি ঈমান আনাও আবশ্যিক।

পৃথিবীতে সাধারণত যারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে তারা মূলত এই ধোঁকায় পড়েই ছেড়ে দেয়, কেননা তাদের দৃষ্টি বাহ্যিক উপকরণে নিবদ্ধ থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ- যখন দেখে যে, কুইনাইন সেবনের মাধ্যমে জ্বর নেমে যায়, তখন বলে ওঠে খোদা আবার কে, এটাই তো সেই জিনিস যার মাধ্যমে জ্বর কমে যায়। অনুরূপ কথা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও বলে আর বাহ্যিক উপায়-উপকরণ দেখে খোদাকে অস্বীকার করে বসে। কিন্তু ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর চূড়ান্ত কারণ হলো ফেরেশতা আর এটি এমন এক নির্দেশ যে, সমস্ত বিজ্ঞান এ থেকেই উদ্ভূত। কেননা এক্ষেত্রে খোদা তা'লা বলেছেন, তোমরা যদি প্রত্যেক বিষয়ের রহস্য অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করো তাহলে এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ প্রকাশ পেতে থাকবে। সেই সময় যখন জগদ্বাসী সকল বস্তুকে প্রায় বাহ্যিক উপকরণ বলে জ্ঞান করছিল তখন ইসলাম একথা ঘোষণা করেছিল যে, প্রত্যেক বস্তুর (পেছনে) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে অণুবীক্ষণযন্ত্র বলছে, প্লেগের গ্রন্থি এমনিতেই হয়ে যায় না বরং এর কারণ হচ্ছে জীবাণু আর তাদের কারণেই গ্রন্থি হয়ে থাকে। এছাড়া সেসব কীট বা জীবাণু সৃষ্টি হবারও অনেক কারণ রয়েছে। সেসব কারণের পেছনে আরো অনেক কারণ রয়েছে। এভাবেই কারণের অন্তরালে রয়েছে অন্য কারণ। (আর) এসব কারণেরই চূড়ান্ত কারণ হলো ফেরেশতার আরা তাঁদের ওপরে রয়েছে আল্লাহ তা'লা। অতএব ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার সুবাদে আদি কারণ বা কারণের উৎপত্তির প্রতি ঈমান অর্জিত হয় আর এর ফলেই খোদা তা'লার প্রতি ঈমান লাভ হয়ে থাকে। আর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার এটিই উদ্দেশ্য।

এছাড়া পবিত্র কুরআনে ঈমান আনার বিষয়টি অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। মানা বা গ্রহণ করাকেও ঈমান বলা হয় কিন্তু শুধুমাত্র কোনো সত্তাকে মানা বা গ্রহণ করাই নয় বরং তার আস্থানে সাড়া দেওয়াকেও ঈমান বলা হয়। যেমন, আল্লাহ তা'লা বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٤﴾

(আল-বাকারা: ২৫৭)

(অর্থাৎ) যে ব্যক্তি তাগুত বা বিদ্রোহী শয়তানকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মজবুত করে ধরেছে যা ভাঙবার নয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

‘তাগুত’ শয়তানকে বলা হয়। এখন অস্বীকারের অর্থ যদি কেবল কোনো বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় তাহলে এই আয়াতের অর্থ এটিই দাঁড়াবে যে, ধ্বংস থেকে সেই ব্যক্তিই রক্ষা পায় যে শয়তানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আর আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে, অথচ এই অর্থ সম্পূর্ণ ভুল। কেননা পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে খোদা তা’লার অস্তিত্বের কথাও বলে আর শয়তানের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে। অতএব এই আয়াতে স্বীকৃতি এবং ঈমানের অর্থ হলো, শয়তানের কথা প্রত্যাখ্যান করে আর খোদা তা’লার কথাকে মেনে নেয়। এখন যদি ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রেও এই অর্থই করা হয় তাহলে তাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হবে, তোমরা তাদের নির্দেশনাসমূহ মেনে চলো। একইভাবে (ঐশী) গ্রন্থাবলি ও রসূলদের প্রতি ঈমান আনার এই অর্থ হবে যে, খোদা তা’লার যে-সব আদেশ ঐশী গ্রন্থাবলিতে আছে তা মান্য করো, রসূল তোমাদের যা কিছু আদেশ দেয় তা শিরধার্য করো। আর কেয়ামতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, এর কথা মাথায় রেখে মন্দ কাজ এড়িয়ে চলো। তাই খোদা, ফেরেশতারা, কিতাবসমূহ এবং রসূলদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, তাদের আদেশ মান্য করা। কেউ হয়ত বলতে পারে, যদি ঈমান আনার অর্থ এটিই হয়ে থাকে তাহলে শুধু এই চারটির প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ কেন দেওয়া হয়েছে? তারা ছাড়াও মুজাদ্দিদগণ আছেন এবং নবী-রসূলদের খলীফাগণও আছেন। তাদের আদেশ মান্য করাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং তাদের অস্বীকার, কুফরি হওয়া উচিত (ছিল)। কিন্তু যেহেতু তাদের অস্বীকার কুফরি নয় তাহলে অন্যদের অস্বীকার কুফরি হবে কেন?

একথা সঠিক যে, খলীফা এবং মুজাদ্দিদগণও ভালো কথা বলেন। কিন্তু খোদা তা’লা, নবীগণ, ফেরেশতারা এবং (ঐশী) গ্রন্থাবলির বিষয়াদি আর তাদের বিষয়াদির মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো, তারা (অর্থাৎ খোদা তা’লা, নবী-রসূল, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ) ঈমানের বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত; যাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের

প্রতি মতভেদকারীও কাফের হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ একথা বলে, মহানবী (সা.) ওয়ু করার সময় পা ধোয়ার যে আদেশ দিয়েছেন তা ঠিক নয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খলীফার সাথে মতপার্থক্য হতে পারে। যেমন- খলীফা একটি আয়াতের যে অর্থ করেন সেটি যদি অন্য কারো বোধগম্য না হয় এবং সে তা না মানে সেটি তার জন্য বৈধ। কিন্তু মহানবী (সা.) সম্পর্কে যে বলবে যে, অমুক আয়াতের তিনি (সা.) যে অর্থ করেছেন আমি সেটি মানি না তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা মহানবী (সা.)-এর বাণী থেকে এক তিল পরিমাণও বাদ দেওয়া কারো জন্য সংগত নয়। যদিও খলীফাদের আদেশ মান্য করা আবশ্যিক, কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামতের সাথে একমত হওয়া আবশ্যিক নয়। হতে পারে, খলীফা কোনো বিষয় সম্পর্কে যে মত দেন তাতে কেউ একমত না-ও হতে পারে। যেমন- যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন, তাদেরকে গোলাম বা দাস বানানো বৈধ কেননা, তারা মুরতাদ ও কাফের। কিন্তু এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) শেষ পর্যন্ত বলতে থাকেন, আমি এ বিষয়ে একমত নই। কিন্তু যদি মহানবী (সা.) এ কথা বলতেন তাহলে এর সাথে দ্বিমত করা তার জন্য বৈধ বা সংগত ছিল না। যেহেতু নবীদের সাথে (ধর্মীয়) মূলনীতির সম্পর্ক তাই তাঁদের সাথে মতবিরোধ কোনোভাবেই বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ! ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খলীফাদের সাথে মতবিরোধ হতে পারে। যেমন- এখনো কোনো কোনো (ধর্মীয়) জ্ঞানের বিষয়ে মতবিরোধ হয়ে যায়। আর অতীতেও আমরা দেখেছি যে, অনেক সময় খলীফাদেরকে অন্যদের কথা মানতে হয়েছে আবার অনেক সময় খলীফাদের কথাও অন্যদের মানতে হয়েছে। যেমন- হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীদের (রা.) মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ ছিল যে, বীর্যপাতের কারণে জুনুবী (নাপাক) হয় নাকি শুধু সংস্পর্শে এলেই (হয়)?

অতএব খলীফাদের সাথে এ ধরনের বিষয়ে মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু নবীদের সাথে হতে পারে না। মহানবী (সা.)-এর সাথে যদি কেউ শুধু আভাহিয়াতে তর্জনী ওঠানোর বিষয়ে মতবিরোধ করে তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু মুজাদ্দিদ এবং খলীফারা এমন নন যে, মাসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রেও যদি তাদের সাথে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে মানুষ কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু নবীদের সাথে তুচ্ছ বিষয়ে দ্বিমত পোষণকারীও কাফের হয়ে যায়। তাঁদের কোনো কথা বোধগম্য হোক বা না হোক এটি বলা আবশ্যিক যে, নবী যা বলেন তা-ই সত্য।

মোটকথা, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, ফেরেশতারা যা বলে তা সঠিক। তাই এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ফেরেশতারা যা বলে তা মান্য

করো অর্থাৎ, ঈমান আনো। আর কুরআন থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ফেরেশতারা যা বলে তা সঠিক হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনে উদাহরণ দিয়ে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে, ফেরেশতাদের না মানার পরিণাম কী হতে পারে? আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدْ وَإِلَادِمَ فَسَجَدَ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ
(আল-বাকার: ৩৫) ۝ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন ফেরেশতাদেরকে আদমের আনুগত্য করার নির্দেশ দেন, তখন সে আনুগত্য করে। কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করে এবং কাফের হয়ে যায়।”

এখন কুরআন থেকে এটি জানা যায়, ইবলিস ফেরেশতা ছিল না বরং জিন্ন ছিল এবং ফেরেশতাদের গণ্ডি-বহির্ভূত ছিল। তাহলে যে ফেরেশতা ছিল না সে কীভাবে জানল যে, আদমকে সিজদা করা উচিত, কেননা আদেশ তো কেবল ফেরেশতাদেরই দেওয়া হয়েছে। ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিল বলেই তার পক্ষে এটি জানা সম্ভব ছিল, কিন্তু সে তা অমান্য করে। পরিণাম কী হয়েছে? সে কাফের বা অস্বীকারকারী হয়ে যায়। তাই ফেরেশতাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া আবশ্যিক কেননা, তা পুণ্যময়ই হয়ে থাকে।

আমি বলে এসেছি যে, ফেরেশতা কাকে বলে, তাদের কাজ কী? আর এটিও (বলেছি), তাদের প্রতি ঈমান আনা কেন আবশ্যিক? তাদের প্রয়োজনীয়তা কী? এছাড়া তাদের সম্পর্কে যে-সব আপত্তি করা হয় সেগুলোরও উত্তর দিয়েছি। কিন্তু তাদের সম্পর্কে আরো প্রশ্ন ওঠে, এখন আমি সেসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

ফেরেশতা এবং তাঁদের সম্পর্ক কত প্রকার?

এখন আমি এটি বর্ণনা করছি, ফেরেশতাদের কল্যাণ কত প্রকার? কিন্তু যেহেতু ফেরেশতাদের কল্যাণের পাশাপাশি এই প্রশ্নেরও উদয় হয় যে, মানুষের সাথে শয়তানের সম্পর্ক কোন ধরনের? কেননা এ দুটি সত্তা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধী, এজন্য আমি এর পাশাপাশি এরও উল্লেখ করব।

স্মরণ রাখা উচিত, ফেরেশতাদের প্রভাব তিন প্রকারের হয়ে থাকে আর শয়তানের প্রভাবও তিন প্রকারের হয়ে থাকে। মানুষের সাথে ফেরেশতার প্রথম যে সম্পর্ক হয় তাকে বলে ‘লিস্মায়ে মালাকিয়াহ্’ অর্থাৎ, ফেরেশতাদের সৃষ্ট প্রেরণা। এর উদাহরণ এমনি যেমন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মানুষ (পথ) ভুলে যায়,

এমতাবস্থায় একজন মানুষ তাকে বলে দেয়— এই পথে নয় বরং সে পথে তোমার যাওয়া উচিত। এভাবে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে পথনির্দেশনা লাভ হয় আর এই সম্পর্ক এমনি যেমনটি এক ব্যক্তির কোনো আগন্তকের বা অপরিচিত লোকের সাথে হয়ে থাকে।

উন্নতি করে সম্পর্ক যখন গভীর হয় তখন এমন হয় যেমনটি ভ্রমণকালে বন্ধুর সাথে বন্ধুর হয়ে থাকে। যে বন্ধু কোনো রাস্তা সম্বন্ধে জ্ঞাত, সে যেকোনো যায়, তার সঙ্গীও সেদিকেই যায়। এমন নয় যে, প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে জিজ্ঞেস করবে— কোথায় যাচ্ছ? অনুরূপভাবে এ মর্যাদায় যখন ফেরেশতা সঙ্গী হয়ে যায় তখন মানুষ এবং ফেরেশতা উভয়ে এক দিকে চলতে থাকে, একে রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মার সাহায্য বলা হয় আর এই সাহায্যকে ‘নুযূল’ বলা হয়ে থাকে। যখন কারো রুহুল কুদুস অবতীর্ণ হবার মর্যাদা লাভ হয় তখন এ সম্পর্ক স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থাৎ, লিম্মায়ে মালাকীর সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী হয়।

আরো এক ধাপ এগিয়ে তৃতীয় পর্যায়ে ফেরেশতা ও মানুষের সম্পর্ক দাস ও মনিবের সম্পর্কের মতো হয়ে যায়। অর্থাৎ, ফেরেশতা কেবল সঙ্গীই থাকে না বরং সে আল্লাহ তা’লার পক্ষ থেকে মানুষের আনুগত্য এবং সেবার আদেশও প্রাপ্ত হয়। তখন সে বন্ধুর মতো নয় (বরং) সেবকদের মতো সঙ্গে থাকে। এটিই সেই মর্যাদা যে-কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এলহাম হয়েছে, ‘আগ হামারী গোলাম বালকেহু গোলামোঁ কী গোলাম হ্যায়’ অর্থাৎ “আগুন আমাদের দাস বরং দাসানুদাস।” (তায়কেরা, পৃ. ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ)

আগুনের দাস হবার অর্থ হচ্ছে, আগুনের ফেরেশতা তাঁর (আ.)-এর দাস ছিল। এবং فَقَعُولُهُ سَجْدِينَ [অর্থাৎ, “তোমরা তার জন্য সেজদায় পড়ে যাও।”— অনুবাদক (আল-হিজর: ৩০)] এর অর্থও এটিই যে, প্রথম আদম (আ.) সম্পর্কে ফেরেশতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়—, তাঁর আনুগত্য ও দাস হয়ে যাও। যেহেতু প্রথম আদম (আ.) সম্পর্কে ফেরেশতার নির্দেশ পেয়েছিল, সেখানে দ্বিতীয় আদম (আ.) {হযরত মসীহ মওউদ (আ.)} যিনি মর্যাদায় প্রথম আদম (আ.)-এর চেয়েও এগিয়ে তাঁর জন্য কেন এটি বলা হবে না যে, “আগুন তোমার দাস বরং তোমার দাসানুদাস।”

এই পদমর্যাদার মানুষের জন্য ফেরেশতার অবস্থা সেবকতুল্য হয়ে থাকে। (তখন) তার থেকে পৃথক হওয়া বা তাকে ছেড়ে দেবার অধিকার তার থাকে না। একজন চাকর চাকরি ছেড়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু ফেরেশতা ছেড়ে যেতে পারেন না। এ হলো নবীদের (আ.) পদমর্যাদা।

শয়তান এবং মানুষের সম্পর্কও এসব মর্যাদার সদৃশ বা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে। শয়তানের সাথে সম্পর্ক যারা রাখে তাদের প্রথম পদমর্যাদা হয়ে থাকে শয়তানি করা। যেমন— কেউ সোজা পথে যাচ্ছে, কিন্তু দুষ্ট লোক তাকে অযথা ঠাট্টাচ্ছিলে বলে— এদিকে নয়, বরং সেদিকে যাও। কেউ যদি তার কথা শোনে তাহলে সে পথভ্রষ্ট হয়। শয়তান গুরুতে এভাবেই ধোঁকা দেয় আর যখন কেউ তার ফাঁদে পা দেয় তখন সে তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। কিন্তু সে সময় তার সাথে যে-সব ফেরেশতা উপস্থিত থাকে (এবং) তারা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু কেউ যখন বার বার শয়তানের কথা মানতে থাকে তখন সে ওই অবস্থা থেকে আরো হীন অবস্থায় চলে যায় আর শয়তানের সাথে বার বার সাক্ষাতের ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'লা বলেন: ﴿وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۝ۙ﴾

অর্থাৎ, ‘শয়তান তাদের সঙ্গী হয়ে যায় এবং সঙ্গী হিসেবে সে খুবই মন্দ’ (আন-নিসা: ৩৯)। এটি হলো, দ্বিতীয় ধাপ।

এরপর তৃতীয় পর্যায় বা স্তর আরম্ভ হয় অর্থাৎ, শয়তান মনিব সেজে বসে আর মানুষ তার দাস হয়ে যায়। এমন লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'লা বলেন, ‘আবাদাত তাগুত’ অর্থাৎ, তারা শয়তানের ইবাদত করে এবং তার দাস হয়ে যায়। অর্থাৎ, যে পুণ্যের দিকে ধাবমান থাকে সে পরিশেষে ফেরেশতার ওপর আরোহণ করে, আর যে মন্দের পানে অগ্রসর হয়, অবশেষে শয়তান তার ওপর ভর করে। এ হলো পাপ-পুণ্যের তিনটি ধারা যা বান্দার সাথে সম্পর্ক রাখে।

এখন প্রশ্ন জাগে, প্রত্যেক মানুষই যেহেতু এই অবস্থাগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি অবস্থায় থাকে, তবে কি প্রত্যেক মানুষের সাথেই পৃথক পৃথক ফেরেশতা থাকে? এর উত্তর হলো, হ্যাঁ। প্রত্যেক মানুষের সাথে পৃথক পৃথক ফেরেশতা থাকে যেমনটি আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। প্রকৃত বিষয় হলো, ফেরেশতা দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক হলো তারা, যাদের মধ্য থেকে একজন বা দু'জন করে প্রত্যেক মানুষের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। যেমন খোদা তা'লা বলেন,

﴿اِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلٰیهَا حَافِظٌ ۝ۙ﴾ অর্থাৎ, “এমন কোনো প্রাণ নেই যার ওপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারিত নেই” (আত-তারেক: ৫)। এ থেকে বোঝা গেল, প্রত্যেক মানুষের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। দ্বিতীয় প্রকার ফেরেশতা হলো তারা, যাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেক মানুষের সাথে সম্পর্ক থাকে এবং প্রত্যেক মানুষের ওপরই তাদের কম-বেশি প্রভাব পড়ে থাকে। যেমন,

জিবরাঈল (আ.) সবার ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। এসব ফেরেশতার সাহায্যকারীও থাকে যারা তাদের প্রভাব অন্যান্য বস্তুর মাঝে বিস্তৃত করে।

এখন প্রশ্ন জাগে, যদি এক ফেরেশতাই সব মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাহলে ফেরেশতার কীভাবে নাযিল হয় বা অবতরণ করে। এজন্য স্মরণ রাখবে, ফেরেশতাদের নুযূল (অবতরণ) পবিত্র কুরআনের একটি পরিভাষা। এটি আক্ষরিক অর্থে ফেরেশতা আগমনের অর্থে নেবার বিষয় নয় বরং এর অর্থ হলো, ফেরেশতা স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। দেখো! খোদা তা'লার জন্যও নুযূল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, লাইলাতুল কদরের শেষ প্রহরে খোদা নীচে নেমে আসেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে, খোদা তা'লা সে সময় নিজের প্রভাব অনেক বেশি বিস্তার করেন। জিবরাঈল (আ.)-এর নুযূলের অর্থও এটিই হবে যে, জিবরাঈল (আ.)ও নিজে অবতরণ করে না, কেননা সে তো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে নড়ে না। নিজের সেই স্থানে বসেই (সে) প্রভাব বিস্তার করে। দেখো! সূর্য যখন আয়নার ওপর প্রভাব ফেলে তখন এমন নয় যে, সে নীচে নেমে আসে। অনুরূপভাবে জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আসত না বরং তার প্রতিচ্ছায়া আসত। মানুষের অবয়বে সে যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে এসেছিল, তখন সে স্বয়ং আসে নি, বরং সে স্বীয় প্রভাবে মানুষের একটি অবয়ব ধারণ করেছিল, (আর) সেই অবয়ব এসেছিল। নয়তো সে তো যেখানে আছে সেখানেই অবস্থান করে।

অতএব তার নুযূল বা অবতরণের তাৎপর্য হলো, যেভাবে আয়নায় সূর্য প্রতিবিম্ব ফেলে একিভাবে জিবরাঈল (আ.) এমন হৃদয়ে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে, যে তার প্রভাব গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে আর এটিই তার নুযূল বা অবতরণের (অর্থ)। যখন এই নুযূল হয় তখন রুহুল কুদুস অর্থাৎ পবিত্র আত্মা মানুষের সঙ্গী হয় আর তার সব কাজ সে তার মাধ্যমে করে। এ কথাই হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে জানা যায়। খ্রিষ্টানরা বলে, শয়তান তাকে ধোঁকা দিত। খোদা তা'লা বলেন, তাঁর সাথে তো জিবরাঈল (আ.) ছিল (তাই) শয়তান তাকে কীভাবে ধোঁকা দিতে পারে!

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, যেহেতু জিবরাঈল (আ.)-এর নাযিল বা অবতরণের অর্থ হলো, সে তাঁর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে, তাহলে যত এমন মানুষ অতিবাহিত হয়েছে যাদের ওপর জিবরাঈল (আ.)-এর ছায়া পড়ত, তাদের সবার একি রকম বা অভিন্ন হওয়া উচিত ছিল। মহানবী (সা.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) তাঁদের সবার একই পদমর্যাদা হওয়া উচিত। কিন্তু এটি ভুল কথা, কেননা প্রতিবিম্ব বা ছায়া ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং এজন্য শুধু এটিই দেখা হয় না যে, প্রতিবিম্ব বা ছায়াটি

কার? বরং এটি দেখাও আবশ্যিক যে, প্রতিবিশ্ব বা ছায়া কার ওপর পড়েছে? লোহার পাতের ওপর সূর্যের যে প্রতিবিশ্ব পড়বে সেটির এক রকম প্রতিফলন হবে এবং আয়নার ওপর যে প্রতিবিশ্ব বা ছায়া পড়বে সেটির প্রতিফলন ভিন্ন রকম হবে। নিঃসন্দেহে জিবরাঈল (আ.) একজনই এবং তাঁর ছায়াও এক রকম। কিন্তু (যার) হৃদয় যতটা পবিত্র ছিল, তার চেহারাও ততই উন্নত দৃশ্যমান হয়েছে। এজন্যই জিবরাঈল (আ.) একজন হওয়া সত্ত্বেও যাদের ওপর তার প্রতিবিশ্ব পড়েছে তারা ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মূসা (আ.) মূসা-ই ছিলেন আর মুহাম্মদ (সা.), মুহাম্মদ (সা.)-ই। আর এ কারণেই মহানবী (সা.) সব নবীর চেয়ে উঁচু পদমর্যাদা ও উঁচু মানের আখ্যায়িত হয়েছেন। অর্থাৎ, একজনই সকল নবীর ওপর ছায়া ফেলেছেন, নতুবা প্রতিবিশ্ব সৃষ্টিকারী যদি ভিন্ন ভিন্ন হতো, তাহলে বলা যেত, মহানবী (সা.)-এর ওপর ছায়া প্রদানকারী যেহেতু উন্নত মানের ছিল তাই তিনি (সা.) উন্নত মান অর্জন করেছেন এবং অন্যান্য নবীর ওপর ছায়া প্রদানকারীরা যেহেতু এমন ছিল না; তাই তারা মহানবী (সা.)-এর চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁদের ওপরও যদি সে-ই ছায়া ফেলত, যে মহানবী (সা.)-এর ওপর (ছায়া) ফেলেছিল তাহলে তারাও সেই মর্যাদা অর্জন করতে পারত যা মহানবী (সা.) অর্জন করেছেন। কিন্তু যেহেতু ছায়া বিস্তারকারী একজনই তাই তাদের পদমর্যাদায় যে ভিন্নতা রয়েছে তা তাদের নিজ নিজ হৃদয়ের স্বচ্ছতার ওপর নির্ভর করে। কেননা একই জিনিস যখন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ওপর সমান প্রভাব ফেলে, তখন তাদের নিজ নিজ ধারণক্ষমতা অনুযায়ী ফলাফল প্রকাশ করে। যাদের ওপর ছায়া পতিত হয় তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার মাঝে পার্থক্য থাকলে একই বস্তুর ছায়া পড়া সত্ত্বেও ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর এটিই মহানবী (সা.)-এর সব নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব যে, তাঁর হৃদয় সবচেয়ে উত্তম ও স্বচ্ছ ছিল এবং তাতে যে প্রতিফলন ঘটেছিল তা সর্বোৎকৃষ্ট ছিল।

একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কখনো কখনো কল্যাণের ধরন অনুযায়ী তার অন্য নাম রাখা হয়ে থাকে। এভাবে তা রুহুল কুদুসেরই কল্যাণ হয়ে থাকে আর কল্যাণের ধরন বা প্রকৃতি হৃদয়ের স্বচ্ছতা অনুযায়ী হয়ে থাকে। দেখো! সূর্যের আলোক প্রতিফলিত হয়, আর যদি জানা থাকে যে, এর জন্য আয়না খুবই উত্তম, তখন প্রতিফলন কি এর ওপরই করা হবে নাকি লোহার পাতের ওপর নেবে? মহানবী (সা.)-এর হৃদয় যেহেতু ছিল সর্বোত্তম, সেহেতু তাঁর (সা.) ওপর কল্যাণের যে প্রতিফলন ঘটেছে তা যেহেতু সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে বেশি ছিল এজন্য কেয়ামত পর্যন্ত তা-ই বিদ্যমান থাকবে আর এভাবেই কল্যাণ ধারার প্রকৃতি বদলে গেছে।

দেখো! হযরত ঈসা (আ.)-কে জিবরাঈল (আ.)-এর কল্যাণ ধারা দিব্যদর্শনে কবুতরের আকৃতিতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছে এই কল্যাণ ধারা মানুষের আকৃতিতে এসেছে যা অনেক উন্নত এবং সবচেয়ে পরিপূর্ণ কল্যাণ ধারা। কাজেই, আশিসের ধরনেও ভিন্নতা রয়েছে। আশিস ধারার প্রকৃতির এ পার্থক্যের কারণেই জিবরাঈল (আ.)-এর কয়েকটি নাম রয়েছে, (যেমন) রুহুল কুদুস, রুহুল আমীন ইত্যাদি। জিবরাঈল (আ.)-এর নাম রুহুল কুদুস সেই পবিত্র বাণীর কারণে যা সে অবতীর্ণ করে। আর তাঁর উপাধি রুহুল আমীন সেসব পবিত্র বাণী অবতীর্ণ করার কারণে যা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ এবং সবরকমের দ্রুতি থেকে নিরাপদ রাখার আবশ্যিক দায়িত্বও তাঁরই। এই নাম, জিবরাঈল (আ.) লাভ করেছেন মহানবী (সা.)-এর ওপর বর্ষিত কল্যাণধারার সুবাদে। যেন মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহের জন্য জিবরাঈল (আ.) তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ অর্থাৎ, তাঁর (সা.) কারণেই জিবরাঈলের আরো একটি উপাধি লাভ হলো।

অর্থাৎ অন্যান্য নবীর ওপর রুহুল কুদুসরূপে জিবরাঈলী প্রতিফলন ঘটেছে কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রতি রুহুল আমীন রূপে প্রতিফলন ঘটে, যার কাজ শুধু পবিত্রতা সৃষ্টি করাই নয় বরং সে পবিত্রতাকে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখাও। রুহুল আমীনের মাঝে পবিত্রতার দিকটিও এসে গেছে এবং এর পাশাপাশি স্থায়ীত্বও লাভ হলো, এ কারণেই এই নাম রুহুল কুদুস-এর চেয়ে উত্তম বা শ্রেয়।

ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ নাকি মানুষ?

এখন আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি— ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ নাকি মানুষ? কেননা পূর্বে যেখানে এ কথার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে যে, ঈসা (আ.), মুসা (আ.), মহানবী (সা.) প্রমুখ তাঁদের প্রতি জিবরাঈলের প্রতিফলন ঘটা বা জিবরাঈল অবতীর্ণ হবার কারণে এই মর্যাদায় পৌঁছেছেন, তাই এ বিষয়ে কারো হৃদয়ে ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, কে শ্রেষ্ঠ? যে তাঁদের ওপর প্রতিফলন ঘটালো নাকি তাঁরা যাঁরা তার প্রতিফলনের সুবাদে উন্নত পদমর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন?

স্মরণ রাখা উচিত, হযরত ঈসা (আ.), হযরত মুসা (আ.) এবং মহানবী (সা.)-এর ওপর জিবরাঈলী প্রতিফলন ঘটা সত্ত্বেও তাঁরা জিবরাঈল (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর এর অনেক কারণ রয়েছে।

- (১) নিঃসন্দেহে জিবরাঈল (আ.) প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে, তবে মাধ্যম হিসেবে। নতুবা (কল্যাণের) প্রকৃত প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন কেবল

খোদা তা'লা। এর উদাহরণ এমনই যেমন সূর্যের (আলোর) প্রতিফলন আয়নাতে হয় এবং তা থেকে অন্য কোনো বস্তুর ওপর পড়ে। জিবরাঈল (আ.) খোদা তা'লার কাছ থেকে আলো গ্রহণ করে তার বিস্তার ঘটায়, নিজের পক্ষ থেকে নয়। মাধ্যম কখনো উৎকৃষ্ট মানের হয় আবার কখনো নিকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট মাধ্যমের উদাহরণ হলো আয়না, যাতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় হয়। আয়না সেই বস্তুর চেয়ে উন্নত হবে যার ওপর তার মাধ্যমে আলোর প্রতিফলন ঘটবে। নিকৃষ্টের উদাহরণ হলো, রাজা পত্র লিখে চাপরাশিকে দিয়ে বলবে অমুক মন্ত্রীকে পৌছে দাও; (কিন্তু) সে (অর্থাৎ চাপরাশি) জানেও না যে, চিঠিতে কী আছে বা কী নেই? তার কাজ কেবল (তা) পৌছে দেয়া। অথবা উদাহরণস্বরূপ- তার মাধ্যমে কোনো মৌখিক বার্তা প্রেরণ করে, সেক্ষেত্রেও মন্ত্রী তাকে যা কিছু বলবে তা (সেই) বার্তাবাহকের চেয়ে পরিপূর্ণ অর্থবোধক বা প্রাঞ্জল হবে। এই উদাহরণকে দৃষ্টিপটে রেখে আমরা বলতে পারি, সম্ভবত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে খোদা তা'লার জ্যোতি নবীর ওপর পড়ে কিন্তু জিবরাঈল (আ.) জানেও না যে, (সেটি) কী? হাদীস থেকেও এটি জানা যায়। মিরাজ সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একটি স্থানে গিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে বলে, এরপর আপনিই যান, আমি যেতে পারব না। কাজেই, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে যা-ই পৌছানো হয়েছে তার দৃষ্টান্ত বার্তাবাহককে দিয়ে কারো কাছে বার্তা প্রেরণের মতো যার কিয়দাংশ সে বুঝতে পারে আর (যাতে) এমন কিছু ইঙ্গিত রয়েছে যা কেবল বার্তাপ্রাপকই বুঝতে পারে অথবা বার্তাপ্রেরক বুঝতে পারবে। অনুরূপভাবে জিবরাঈল (আ.)-কে প্রদত্ত বার্তা তিনি বহন করে নিয়ে গেছেন বটে কিন্তু তাতে এমন বিষয়াদি রয়েছে যা কেবল খোদা এবং রসূলই বুঝতে পারেন।

এই উদাহরণটি এমন যে, জিবরাঈল (আ.) যা কিছু নিয়ে যায় তা তার জন্য বোঝা সম্ভব ছিল না। এছাড়া যে অংশ জিবরাঈলের জন্য বোঝা সম্ভব ছিল সেক্ষেত্রেও মহানবী (সা.) তার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন বা বেশি বুঝতেন। এ বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। (ধরুন,) দু'জন মানুষ জুরে আক্রান্ত আর উভয়কেই (যদি) কুইনাইন দেওয়া হয় তাহলে অনেক সময় একজনের ওপর তড়িৎ প্রভাব পড়বে আর অন্যজনের ক্ষেত্রে খানিকটা বিলম্বে। এমনটি কেন হবে? জানাকথা, এই তারতম্য তাদের দু'জনের ব্যক্তিগত (রোগপ্রতিরোধ) ক্ষমতার কারণে। যার দেহে কুইনাইনকে পরাস্ত করার উপাদান বিদ্যমান থাকবে তার ওপর অপেক্ষাকৃত

কম এবং দেরিতে কাজ করবে। যার দেহ সবল ও সুঠাম, তার ওপর দ্রুত কাজ করবে এবং জ্বর নেমে যাবে।

এটি হলো অনিষ্ট বা রোগ প্রতিরোধ করার শক্তিগুলোর মাঝে পারস্পরিক পার্থক্যের উদাহরণ। কল্যাণ লাভ করার ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই। দু'ব্যক্তি একই খাবার গ্রহণ করে (অথচ) একজন অনেক মোটা ও শক্তিশালী হয়, অন্যজন ততোটা লাভবান হয় না। যদিও কখনো কখনো সে পূর্বের চেয়ে বেশি পরিমাণে খাবার খায়। অনুরূপভাবে জিবরাঈল (আ.) এবং মহানবী (সা.) উভয়ই যে শিক্ষামালা বুঝতেন এক্ষেত্রেও মহানবী (সা.) শ্রেষ্ঠ ছিলেন কেননা, তা (অর্থাৎ সেই শিক্ষা) তাঁর (সা.) এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) উভয়ের ওপর যার যার ক্ষমতা বা সামর্থ্য অনুযায়ী প্রভাব বিস্তার করত।

একথাটি এভাবে আরো সহজে অনুধাবন করা সম্ভব কেননা এখন আমি এই প্রবন্ধটি উর্দু ভাষায় বর্ণনা করছি আর প্রত্যেকেই তা বুঝতে পারবে কিন্তু সবাই সমানভাবে বুঝে না এবং সবার ওপর সমান প্রভাবও পড়ে না। এছাড়া কথাবার্তার ওপর মনের প্রভাবও পড়ে। সূরা ফাতেহার প্রতি লক্ষ্য করো। তা পাঠ করার সময় কারো কারো চিৎকার করে কান্না চলে আসে আবার কেউ পাঠ করলে তার চেহারা প্রফুল্লতা প্রকাশ পায়। এর কারণ হলো, যার হৃদয়ে কান্নার স্বভাব বা প্রবণতা বিদ্যমান সে বিপদগ্রস্ত হলে এটি (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) পাঠ করে মনে করে যে, একমাত্র খোদা-ই আমার বিপদ দূর করতে পারেন, এর ফলে তার বুকফেটে কান্না আসে। কিন্তু অপর ব্যক্তি যে চতুর্পাশে সাফল্য ও কৃতকার্যতা দেখে আর সে মনে করে; খোদা-ই আমার সুরক্ষাকারী- কে আছে যে আমাকে ধ্বংস করতে পারে? এই বিশ্বাসের কারণে এটি পাঠ করার সময় তার চেহারা হাস্যোজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। কাজেই হৃদয়ের অবস্থা অনুযায়ী একই কথার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পড়ে থাকে।

অতএব মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ বাণী তাঁর (সা.) মাঝে অন্তর্নিহিত মানবীয় শক্তিবৃন্তির সাথে একাকার হয়ে একটি ভিন্ন ফলাফল ও ভিন্ন অর্থ সৃষ্টি করত আর হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ভেতর যেহেতু ভিন্ন শক্তিবৃন্তি ছিল তাই তার সাথে মিলে ভিন্ন ফলাফল বয়ে আনত। আর জানা কথা যে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ চুনের ওপর ইট রাখা হলে কিছু হবে না কিন্তু যদি পানি ঢালা হয় তাহলে আগুন ধরে যাবে কেননা, চুন এবং পানির সংমিশ্রণে এই ফলাফল সৃষ্টি হয়। কাজেই, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর প্রতি যা-ই অবতীর্ণ হয়েছে তা যদিও জিবরাঈল (আ.) বুঝতেন কিন্তু মহানবী (সা.) যে শক্তিবৃন্তির অধিকারী ছিলেন তা জিবরাঈল

(আ.)-এর ছিল না বিধায় তিনি মহানবী (সা.)-এর মতো বুঝতে পারতেন না আর এ কারণেই মহানবী (সা.) এ ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ ।

তবে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখতে হবে, সব মানুষই ফেরেশতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় । বিশেষ বিশেষ মানুষ বিশেষ বিশেষ ফেরেশতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর সাধারণ মু'মিন সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । এর কারণ হলো, ফেরেশতাদের চেয়ে মানুষের দায়দায়িত্ব ব্যাপক আর মানুষ তো এমন যে, তাকে দোষখেও নিক্ষেপ করা যাবে কিন্তু ফেরেশতার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় । সে অন্যায় করতে পারে না কিন্তু মানুষ দু'দিকেই যেতে পারে । চাইলে অন্যায়ও করতে পারে আবার সৎকর্মও করতে পারে । তাই যে সৎকর্ম করে, সে সাধারণ মানের মু'মিন হলেও সাধারণ ফেরেশতাদের ওপর শ্রেষ্ঠ রাখে ।

বক্তৃতার বাকি অংশ

(যা ২৯ ডিসেম্বর, ১৯২১ তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)

কর্তৃক সাড়ে নয়টায় মসজিদে নূরে প্রদত্ত)

তাশাহুদ, তা'আউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর {হযূর (রা.)} বলেন,

জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছে, কেন এটি বিশ্বাস করা হবে না যে, (কোনো) বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলি (সেই) বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত এবং ফেরেশতাদের প্রভাবাধীন নয়? একথা গ্রহণ করার কী কারণ থাকতে পারে যে, বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্য ফেরেশতাদের দ্বারা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত?

আমি ফেরেশতাদের (অস্তিত্বের) প্রমাণ দিতে গিয়ে বিভিন্ন যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছি এবং সেসবের মাধ্যমে ফেরেশতাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছি। যেহেতু ফেরেশতাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে তাই সেগুলোর প্রয়োজনীয়তাও আপনা-আপনিই প্রমাণিত হয়ে গেল। যখন কোনো বিষয় যুক্তিপ্রমাণের আলোকে সাব্যস্ত হয় তখন আর একথা বলার অবকাশ থাকে না যে, যেহেতু এর অস্তিত্বের অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে তাই সেই কারণকেই কেন মানা হবে না? যেমন ধরুন, বাতাস কাগজকে উড়িয়ে নেয় আর এর ফলে কাগজ উড়ে গিয়ে টেবিলে পড়তে পারে। কিন্তু কাউকে যদি কাগজটি উঠিয়ে নিয়ে টেবিলে রাখতে দেখে তাহলে এমন প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত নয় যে, এটি কেন বিশ্বাস করা হবে না যে, বাতাসই কাগজটি উড়িয়ে নিয়ে এসেছে? অতএব যেহেতু ফেরেশতাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে তাই বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলি বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত, ফেরেশতাদের সাথে নয়— এই সম্ভাবনা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। সম্ভাবনা ভিন্ন বিষয় আর যুক্তিপ্রমাণের আলোকে (কোনো) ঘটনা প্রমাণ হওয়া ভিন্ন বিষয়। উদাহরণস্বরূপ— এই যে বলা হয়, হযরত ঈসা (আ.) আকাশে যান নি। এটি এজন্য বলা হয় না যে, তাঁর পক্ষে আকাশে যাওয়া সম্ভব নয় বরং এর বিপক্ষে যুক্তিপ্রমাণ থাকার কারণে (তা) বলা হয়, এরপর আর কোনো জল্পনা-কল্পনা বা ধারণার অবকাশ নেই। অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ না থাকলেই কিয়াস তথা ধারণা করে কথা বলা যায়। কিয়াস বা ধারণাভিত্তিক কথা এবং সম্ভাবনার অর্থ হলো, অন্য কোনো উপায়ও থাকতে পারে

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যাবতীয় সম্ভাবনা একটি বিষয়েই পাওয়া যাবে। অতএব হতে পারে বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলি বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত আর একথাটি সম্ভাবনা মাত্র কিন্তু অন্যান্য যুক্তিপ্রমাণের আলোকে সাব্যস্ত হয় যে, (বস্তুতপক্ষে বিষয়টি) এমন নয় বরং বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলি ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এছাড়া আমরা একথা বলি না যে, বস্তুর মাঝে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই; এটি আমাদের দাবি নয় বরং আমাদের দাবি হলো, বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলি প্রকাশের প্রাথমিক কারণ হলো ফেরেশতারা। ফেরেশতারা (প্রথমে) আদিষ্ট হয় তারপর তারা তাদের পরবর্তী কারণকে প্রভাবিত করে এরপর তারা পরবর্তী কারণকে, আর এভাবে পর্যায়ক্রমে গোটা সৃষ্টিজগতে তাদের প্রভাব প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে।

যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং এটিও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'লা বস্তু সৃষ্টি করেছেন; তাদেরকে একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, বিভিন্ন বস্তুর মাঝে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যাবলিও আল্লাহ তা'লাই গ্রথিত করে দিয়েছেন; অন্যথায় হয় এটি বিশ্বাস করতে হবে যে, বস্তু সৃষ্ট নয়; (অর্থাৎ) আল্লাহ সৃষ্টি করেন নি বরং আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছে আর আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই। কেউ যদি এমন ধারণা করে তবে তাকে ফেরেশতাদের সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে আল্লাহ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাতে হবে। এরপর কেউ যদি খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয় কিন্তু একথা বলে যে, সব কিছু আপনা-আপনি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্ট; তখন তাকে ফেরেশতাদের সম্পর্কে কিছু বলা যাবে। অবশ্য সে যখন এটি স্বীকার করে যে, প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা হলেন খোদা; তখন তার সামনে এই প্রশ্ন রাখা হবে যে, ফেরেশতাদের অস্তিত্বও প্রমাণিত (সত্য)। অতএব তখনই এই প্রশ্ন উত্থাপন করা স্বার্থক হবে যখন কেউ আল্লাহর অস্তিত্বে এবং তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন বলে বিশ্বাস স্থাপন করে নতুবা এটি সম্ভব নয়।

এ কারণেই সেসব জাতি যারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে না অথবা আস্তিক হলেও বস্তুকে সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করে না, তারা ফেরেশতায়ও বিশ্বাস করে না। অতএব প্রথমে এই বিষয়টি সুরাহা করতে হবে, এরপর ফেরেশতাদের বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। আর যখন ফেরেশতাদের সম্পর্কে আলোচনা হবে তখন এর সাথে সাথে এটিও স্বীকৃত আখ্যা দিতে হবে বা দ্ব্যর্থহীন বলে ঘোষণা করতে হবে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব এবং (বস্তুর) মূল উপাদান সৃষ্ট বলে স্বীকার করা হচ্ছে। আর কেউ যখন এসব বিষয় বিশ্বাস করবে তখন তাকে একথাও মানতে হবে যে, খোদা তা'লা বিভিন্ন বস্তুর মাঝে যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত রেখেছেন; এ সম্পর্কে আমাদের দাবি শুধু এতটুকুই যে, খোদা তা'লা বিভিন্ন বস্তুর মাঝে সরাসরি

বৈশিষ্ট্যাবলি অন্তর্নিহিত রাখেন নি বরং ফেরেশতাদের মাধ্যমে রেখেছেন। কেননা বস্তুজগৎ স্থূল আর খোদা তা'লার (সত্তা) সূক্ষ্ম। এছাড়া আমরা প্রাকৃতিক নিয়মাবলি প্রত্যক্ষ করে এই ফলাফল নির্ণয় করতে বাধ্য যে, স্থূল বস্তুর ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য আল্লাহ তা'লা বিভিন্ন মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন। যাবতীয় সূক্ষ্ম বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, স্থূল বস্তুর সাথে সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। স্থূল বস্তু নিজগুণে সূক্ষ্ম (সত্তার) সাথে (সরাসরি) সম্পর্ক রাখতে পারে না। মানুষকেই দেখো! তার মাঝে হৃদয়, আত্মা কিংবা Mind যা-ই বলো না কেনো—এমন কোনো কিছু আছে; যার সাহায্যে মানুষ সব কাজকর্ম করে আর যখন এটি থাকে না তখন মানুষ প্রাণহীন হয়ে পড়ে কিন্তু তার অভ্যন্তরস্থ সেই বস্তুটি তাকে বলে না যে, এটি করো বা এটি করো না বরং এটি অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্নায়ুকে প্রভাবিত করে এবং সে তার পরবর্তী বিভিন্ন সূক্ষ্ম স্নায়ুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে আর এভাবে পর্যায়ক্রমে (দেহের) কোনো অঙ্গে গতি সৃষ্টি হয় এবং তা সক্রিয় হয়। উদাহরণস্বরূপ— আত্মা বা মন সরাসরি চোখকে কোনো নির্দেশ দেয় না বরং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রে প্রভাব বিস্তার করে (আর) ক্রমান্বয়ে তার ওপর নিজের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মোদাকথা, যত সূক্ষ্ম বস্তু রয়েছে তা মাধ্যমের সাহায্যে স্থূল বস্তুর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। কাজেই আমরা বলতে চাচ্ছি, আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব প্রমাণিত আর তাঁর সকল বস্তুর স্রষ্টা হওয়া সর্বজন স্বীকৃত। অতএব এটিও অনস্বীকার্য যে, কোনো না কোনো মাধ্যমেই বিভিন্ন বস্তুর সাথে তাঁর সম্পর্ক বিরাজমান আর সেই মাধ্যমকেই আমরা ফেরেশতা বলি। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না অথবা তাঁকে সকল বস্তুর স্রষ্টা মানে না তার সামনে আমরা ফেরেশতা সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করব না বরং প্রথমে তাকে বিশ্বাস করাবো যে, আল্লাহ্ আছে এবং তিনি পৃথিবীর স্রষ্টা। আর যে এটি স্বীকার করবে তাকে প্রাকৃতিক বিধানে অভিনিবেশ করে নিশ্চিতরূপে একথা মানতে হবে যে, কোনো (পরম) সূক্ষ্ম কিন্তু সৃষ্ট সত্তার এমন অস্তিত্ব বিদ্যমান যারা আল্লাহ্ এবং বাহ্যিক সৃষ্টিজগতের মাঝে মাধ্যম হিসেবে সক্রিয় আর এটি এমন (এক) বিষয় যা বিজ্ঞানের আলোকেও প্রমাণিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি বস্তুর পেছনে কোনো না কোনো কারণ আছে। সূক্ষ্ম কারণ (অপেক্ষাকৃত) স্থূল কারণ বা উপাদানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আর সেটি তার চেয়ে স্থূল কারণ বা উপাদানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আর এভাবে পর্যায়ক্রমে এই ধারা অব্যাহত থাকে। অতএব আমরা বিশ্বাস করি, কুইনাইনে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্য কারণ বা অন্যান্য উপাদান দায়ী। তাছাড়া কুইনাইনও বিভিন্ন উপাদানের যৌগবিশেষ আর কোনো বস্তুই এককভাবে গঠিত নয় বরং সবকিছুই যৌগ। কুইনাইনের মাঝে

বিশেষ একটি উপাদান রয়েছে যা জ্বরের (রোগীর) ওপর ক্রিয়া করে আর এই উপাদানের ক্রিয়া অন্য কতক প্রচ্ছন্ন উপাদানের ফলে সংঘটিত হয় এবং তা ক্রমাগতভাবে প্রচ্ছন্ন কারণ বা উপাদানের দিকে ধাবিত হতে থাকে (আর) এর সর্বশেষ মাধ্যম বা কারণ হলো, ফেরেশতারা। তারা সরাসরি আল্লাহ তা'লার মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হয়, কেননা প্রকৃত স্রষ্টা তিনিই। যদি একথা বিশ্বাস না করা হয় বরং বলা হয়, প্রত্যেক বস্তুর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে তবে একথাও মানতে হবে— আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা নন। আল্লাহকে যদি সকল বস্তুর স্রষ্টা জ্ঞান করা হয় তাহলে এটিও স্বীকার করতে হবে যে, প্রতিটি বস্তুর মাঝে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'লা প্রদত্ত। বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলিকে বিভিন্ন প্রচ্ছন্ন উপাদানের ফলাফল হিসেবে পর্যবেক্ষণ করেও মানতে হবে যে, সেসব প্রচ্ছন্ন উপাদানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার আদেশ তাদের কাছে পৌঁছায় এবং এ শিকলেরই সর্বশেষ কড়ার নাম হলো 'মালাক' বা ফেরেশতা।

ফেরেশতাদের অনুপ্রেরণা উজ্জীবিত করে

এখন আমি ফেরেশতাদের প্রেরণা (কীভাবে) উজ্জীবিত করে তা বলছি এবং তা উন্নতি করতে করতে এমন অবস্থায় গিয়ে উপনীত হয় যে, এক প্রেরণা দুটি প্রেরণায় রূপ নেয়। আর কেউ যদি না বুঝে থাকেন তাহলে আবার বলছি, লিমা এর অর্থ হলো, তাহরীক বা প্রেরণা এবং এর উন্নতি করার অর্থ হলো; ফেরেশতারা যে প্রেরণা জোগায় তা বৃদ্ধি পেতে থাকে, (অর্থাৎ) একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে তিনটি, তিনটি থেকে চারটি, এভাবে এক পর্যায়ে বেশ কয়েকটি হয়ে যায়। কেউ যখন একটি প্রেরণা গ্রহণ করার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সেই স্থানে উপনীত হয় যেখানে খোদা তা'লা দেখেন; সে অধিক যোগ্য— তখন তাকে আরো ক্ষমতা দেওয়া হয়। তখন তার মাঝে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণা সম্বণার করে। তার দু'জন রক্ষী নিযুক্ত হয়, এরপর তিনজন আর এভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বিষয়টি আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের মাঝেও লক্ষ্য করি। কেউ কোনো কিছুর সদ্যব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ— যারা (বিভিন্ন বিষয়ে) জ্ঞানচর্চা করে তাদের কাছে নতুন নতুন বিষয়াদি উন্মোচিত হতে থাকে এবং আল্লাহ তা'লাও এই মূলনীতি সম্পর্কে বলেছেন,

(আল-আনকাবূত: ৭০) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ, আর যারা আমাদের পথে চেষ্টা-সাধনা করে তাদেরকে আমরা বিভিন্ন পথপ্রদর্শন করি। খোদা তা'লার পানে পথপ্রদর্শনকারী ব্যক্তির যখন একটি পথে চলেন তখন তাদেরকে নৈকট্য লাভের অন্যান্য পথও বাতলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ,

তারা যখন একটি সৎকর্ম করে তখন আরো নতুন নতুন সৎকর্ম সম্পর্কে তারা জ্ঞান লাভ করে এবং তারা সেগুলোকে কর্মে রূপায়ণ করে। পূর্বে যে-সব সৎকর্মের কল্পনা ও ধারণাও ছিল না, আল্লাহর পথে চেষ্টা সাধনাকারীদের (তা) বলে দেওয়া হয়। যেমন পবিত্র কুরআনেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'লা একস্থানে বলেন, **إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝** {অর্থাৎ, এমন কোনো আত্মা নেই যার ওপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নেই-অনুবাদক। (আত-তারেক: ৫)} অর্থাৎ, প্রত্যেকের সাথে ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে, যে তাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে এবং সৎকর্মের অনুপ্রেরণা জোগায় কিন্তু অন্য আরেকটি আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানুষ যখন সেই ফেরেশতার অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয় তখন সে এমন একটি স্থানে উপনীত হয় যেখানে খোদা তা'লা বলেন; এমতাবস্থায় শয়তান আর তার সাথে থাকে না এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করে দেন। তা যেভাবে হয় তা হলো, মানব হৃদয়ে প্রভাব বিভিন্নভাবে পড়ে। কখনো চোখ, কখনো নাক, কখনো-বা কান, আবার কখনো জিহ্বার মাধ্যমে; বস্তুত এমন অনেক মাধ্যম রয়েছে। আল্লাহ তা'লা এসব মাধ্যমের জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করেন। মোটকথা, মানুষ যখন পবিত্র প্রেরণা গ্রহণ করতে থাকে তখন আল্লাহ তা'লা এবং ফেরেশতার তার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত করে; তাঁরা সেসব প্রবেশদ্বারে বসে পড়ে যে পথ দিয়ে শয়তান (মানবদেহে) প্রবেশ করে হৃদয়কে প্রভাবিত করে। প্রথমে সকল প্রবেশদ্বারের জন্য একজন ফেরেশতা (নিযুক্ত) ছিল আর সে ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য রাখত যেন কোনো পথ দিয়েই শয়তান প্রবেশ করতে না পারে। ক্রমোন্নতির এ ধারায় এমন হয় যে, প্রত্যেক ছিদ্রপথে ফেরেশতা নিযুক্ত হয়। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন,

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ {অর্থাৎ, তাঁর পক্ষ থেকে এ (রসূলের) জন্য তাঁর সামনে ও পেছনে একের পর এক আগমনকারী (ফেরেশতাদের) একদল নিযুক্ত আছে, যারা আল্লাহর আদেশে তার সুরক্ষা করেথ অনুবাদক। (আর-রা'দ: ১২)} ভুলবশত মানুষ জ্ঞান করেছে যে, এই আয়াত সর্বসাধারণের জন্য অথচ এখানে কেবল মহানবী (সা.)-এরই উল্লেখ রয়েছে আর 'লাহ্' সর্বনামটি মহানবী (সা.)-এর দিকেই যায়। আল্লাহ তা'লা বলেন, ইনি আমার এমন বান্দা যার অগ্রে-পশ্চাতে পাহারাদার নিযুক্ত রয়েছে। কোনো শয়তানি কুমন্ত্রণা তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারে না। প্রত্যেক শয়তানি কুমন্ত্রণা তাঁর (সা.) কাছে এসে থেমে যাবে এবং তাঁর (সা.) ধারেকাছে ভিড়তে পারবে না।

এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকের জন্য একজন ফেরেশতাই নিযুক্ত থাকে কিন্তু যারা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত তাদের জন্য কয়েকজন (ফেরেশতা) নিযুক্ত থাকে। অতএব অন্য স্থানেও এর সূক্ষ্ম প্রমাণ পাওয়া যায় আর বোঝা যায় যে, মু'মিন উন্নতি করতে করতে সেই মানে উপনীত হয় যে, ফেরেশতা তার প্রতিটি ছিদ্রপথ আগলে বসে পড়ে আর তা, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَالْمَلَكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا

صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ (আর-রা'দ: ২৪-২৫)

মৃত্যুর পর মানুষ যখন জান্নাতে যাবে তখন প্রতিটি প্রবেশদ্বার দিয়ে ফেরেশতারা এসে তাদেরকে সালাম দিবে এবং বলবে, ধৈর্যের প্রতিদানস্বরূপ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এই আয়াতের অর্থ এটি নয় যে, ফেরেশতা অনেক থাকবে; তাই বিভিন্ন দরজায় এসে সালাম করবে— কেননা ফেরেশতা অনেক থাকলেও একই দরজা দিয়ে আসতে পারবে। আর যদি বলা হয় যে, এত বেশি ভিড় হবে যে, এক দ্বারপথে প্রবেশ করতে পারবে না, তাহলে একথা বলার প্রয়োজন কী আর এর লাভইবা কী হতে পারে? (তারা) এক দরজা দিয়ে আসুক বা ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে আসুক— কথা একই। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হলো, কেয়ামত দিবসে প্রত্যেক দ্বারের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা আসবে আর সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলবে, শয়তানের বিরুদ্ধে তুমি আর আমি যে যৌথ সংগ্রাম করেছিলাম সেক্ষেত্রে তুমি সফল হয়েছে। তখন ফেরেশতা ও মানুষ উভয়ই আনন্দিত হবে। মোটকথা, প্রতিটি রক্তের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতা তার শান্তি কামনা করে দোয়া করবে।

বাকি রইল, দরজা কি অনেকগুলো নাকি (একটি)? জানাকথা আর সব মানুষ জানে যে, বাইরের বা বহিরাগত জিনিস বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন মানুষ কখনো টাকা দেখলে তার হৃদয়ে লোভ সৃষ্টি হয় আর চুরি করতে উদ্যত হয়। তার চোখ যদি না দেখত তবে তার হৃদয়ে এর ধারণাও জাগ্রত হতো না।

আবার কখনো মানুষ যখন শোনে যে, অমুকের কাছে অনেক ধনসম্পদ আছে তখন তার হৃদয়ে চুরি করার বাসনা জাগে। যদি সে না শুনত তাহলে এই আকাঙ্ক্ষাও সৃষ্টি হতো না। একইভাবে কোনো কোনো ধারণা স্পর্শ করার মাধ্যমে, ঘ্রাণ নেবার মাধ্যমে এবং স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। কাজেই, পাপ-পুণ্যের প্রেরণা ও প্ররোচনা এসব মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় আর এসব পথেই শয়তান তার মাঝে

প্রবেশ করে। সেগুলোতে একজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয় যারা সুরক্ষা করতে থাকে এবং কোনো মন্দ চিন্তাভাবনা প্রবেশ করতে দেয় না। কিন্তু বিশেষ এবং সাধারণ মানুষের সেবায় (নিয়োজিত) এসব ফেরেশতার মাঝে একটি পার্থক্য রয়েছে আর তা হলো, সাধারণ মানুষের তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) কেবল মন্দ চিন্তাভাবনা ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয় কিন্তু বিশেষ মানুষের সুরক্ষাকারী (ফেরেশতা) মন্দ চিন্তাভাবনাকেও পুণ্যে রূপান্তরিত করে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ— এমন মানুষ যখন শোনে, অমুক ব্যক্তি সম্পদশালী তখন তার হৃদয়ে ডাকাতি করে সে লোকের সম্পদ হস্তগত করার চিন্তাভাবনা সৃষ্টি হবার পরিবর্তে এই অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয় যে, খোদা তা'লা তাকে আরো দান করুন যেন সে তা পুণ্য কাজে ব্যয় করতে পারে। মোটকথা, এভাবে সকল প্রেরণা তাদের মাঝে পুণ্যরূপ নিয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু খোদা তা'লার নবীদের সাথে এসব ফেরেশতার কেবল এই দুটি কাজই হয় না যে, প্রধানত কোনো মন্দ ধ্যানধারণাকে তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না আর সেটিকে পবিত্র করে হৃদয়ে স্থান দেয় বরং তাঁদের হৃদয়ে সৃষ্টি প্রেরণাগুলোর বাইরেও বিভিন্ন পুণ্য প্রভাব সৃষ্টি করে। খোদা তা'লার নবীর কথা বলার সময়, কারো প্রতি তাঁর তাকানোর সময়, কাউকে স্পর্শ করার সময়; মোটকথা তাঁর সকল অবস্থায় ফেরেশতারা পুণ্য ও পূতঃ প্রভাব সৃষ্টি করতে থাকে।

হয়ত কেউ বলবে, কারো সম্পদ দেখে যখন কারো মনে চুরি করার অভিসন্ধি জাগে তখন এটি তার (মনের) ভেতরে সৃষ্টি হয়, বাইরে সৃষ্টি হয় না। তাই ফেরেশতারা কীভাবে তার সুরক্ষা করতে পারে?

যদিও এটি ভুল কথা, কেননা চুরির যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে, তা কোনো কারণ বা প্ররোচনাকারীর মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে আর কারণ বা প্ররোচনাদাতা বাইরেই থাকবে। অবশ্য অন্যদের মন্দ চিন্তাভাবনারও প্রভাব পড়ে। একজনের মন্দ চিন্তাভাবনা অন্যের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। আর এই প্রভাব স্পর্শ করা, কথা বলা বা পাশে উপবেসনের মাধ্যমে (সৃষ্টি) হয় আর এ বিষয়টি জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রমাণিত বিষয়। মেসমেরিজম (বা সম্মোহন শক্তি) একটি জ্ঞান। ধরুন একজন অন্য একজনকে বলে, ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে এবং হৃদয়ে ধারণা জাগ্রত করে যে, (সে) ঘুমিয়ে পড়েছে। এই ধারণা যখন দৃঢ়ভাবে তার হৃদয়ে দানাবাঁধে, তখন সেই ব্যক্তি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর এমনও হয় যে, তাকে বলা হয় কাঠের মত শক্ত হয়ে যাও, তখন সে তদ্রূপই হয়ে যায়। সে সময় তার কোমরের নীচে কিছু না রেখে যদি তার ওপর (কোনো) ভারী বস্তুও রেখে

তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার কোমর বাঁকা হবে না। একইভাবে যদি বলা হয়, তুই বিড়াল হয়ে গেছিস। তাহলে সে বিড়ালের মত ম্যাঁও ম্যাঁও করতে আরম্ভ করবে অথবা যদি বলা হয়, (তুমি) কুকুর হয়ে গেছ তাহলে কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করবে। কাজেই, একজনের চিন্তাভাবনার প্রভাব অন্যজনের ওপর পড়ে। পৃথিবীতে আমরা দেখি, এমন মানুষও রয়েছে যারা যেখানে থাকে সেই দেশে, যেখানে বসবাস করে সেই শহরে, যেখানে অবস্থান করে সেই গ্রামে তাদের মন্দ প্রভাব পড়ে। এক ব্যক্তির চিন্তাভাবনার প্রভাব অপরজনের ওপর পড়ে। প্রত্যেক মানুষ এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এমনকি শিশুরাও এই প্রভাব অনুভব করে। যেমন, একটি শিশুর চোখ বন্ধ করে যদি কোনো বস্তু কোথাও লুকিয়ে রেখে দেওয়া হয় এরপর সবাই মনে মনে ভাবে, সেই ছেলেটি সেদিকেই যাবে যেখানে সেই বস্তুটি রাখা হয়েছে। সত্যিই সে সেই দিকেই যায় এবং সেই বস্তুটির কাছে পৌঁছে সেটি তুলে নেয়।

এক শিখ ছাত্র, যে গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যয়নরত ছিল এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখত, সে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে একবার সংবাদ পাঠায় যে, পূর্বে খোদার প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন আমার হৃদয়ে তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ দানা বাঁধছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাকে বলে পাঠান, কলেজে তুমি যেখানে বসো সেই স্থান পরিবর্তন করো। অতএব সে সেই স্থান পরিবর্তন করে এবং জানায় যে, এখন আর কোনো সন্দেহ হয় না। একথা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে শোনানো হলে তিনি (আ.) বলেন, তার ওপর এক ব্যক্তির প্রভাব পড়ছিল, যে তার পাশেই বসত সে ছিল নাস্তিক। যখন সে স্থান পরিবর্তন করে তখন তার প্রভাব পড়াও বন্ধ হয়ে যায় আর সন্দেহও থাকে না। কাজেই, অসৎলোকের পাশে বসলে কোনো কথা না বললেও মন্দ প্রভাব পড়ে এবং সৎলোকের পাশে বসলে সে কিছু না বললেও ভালো প্রভাব পড়ে। অতএব পৃথিবীতে (একজনের) চিন্তাভাবনার প্রভাব অন্যের ওপর অব্যাহতভাবে পড়ছেই কিন্তু তা বোঝা যায় না। একজন মানুষ যখন কোনো বৈঠকে যায়, সেখানে কারো হৃদয়ে কোনো মন্দ চিন্তাভাবনা থাকে এবং অন্য কারো মনে অন্য কিছু থাকে। এগুলো তার হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে থাকে এবং তা সে বুঝতেও পারে না। কিন্তু ফেরেশতারা যখন তার প্রতিটি দরজায় দাঁড়িয়ে যায়, (অর্থাৎ) হাত, কান, নাক, মুখ এবং চোখ ইত্যাদির দরজায় আর এমন মানুষ যখন কোনো সভায় যায় তখন তাদের ওপর কোনো ধরনের মন্দ প্রভাব পড়তে পারে না। তার ওপর শুধু পবিত্র প্রভাবই পড়ে থাকে। অতএব মহানবী (সা.) স্বয়ং পবিত্র ছিলেন কিন্তু

অন্যদের শেখানোর জন্য যখন তিনি (সা.) কোনো বৈঠকে বসতেন তখন তিনি ৭০ বার এস্তেগফার করতেন। এর মাধ্যমে তিনি (সা.) মুসলমানদের শিখিয়েছেন যে, তারাও যেন এমনটিই করেন।

কাজেই, চিন্তাভাবনার প্রভাব পড়া একটি সুনিশ্চিত ও প্রমাণিত বিষয়। যারা বেশি পুণ্যবান এবং খোদাভীরু হয়ে থাকেন তাদের প্রতিটি দ্বারপথে যেখান থেকে চিন্তাভাবনা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকে যারা তাদেরকে মন্দ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখে।

শয়তান বলতে কী বোঝায়?

এখন আমি এটি বলছি, শরীয়ত মানুষের ব্যক্তিগত মন্দ চিন্তাভাবনাকেও শয়তানি আখ্যা দিয়েছে। আমার একথার অর্থ এটি নয় যে, শয়তানের কোনো অস্তিত্বই নেই, কেননা আমার এই বিশ্বাসও রয়েছে যে, প্রত্যেক পবিত্র প্রেরণা প্রকৃতপক্ষে মানুষের হৃদয় থেকেই উদ্ভূত হয়; অথচ আমি ফেরেশতা ও তাদের প্রভাবেও বিশ্বাসী।

অতএব আমার কথার অর্থ হলো, শরীয়তের আলোকে জানা যায়, মানুষের চিন্তাভাবনাকেও শরীয়ত শয়তানি আখ্যা দিয়েছে আর এর কারণ হলো, যখন মানুষের হৃদয়ে কুধারণা সৃষ্টি হয় তখন শয়তান এতে নিজের প্রভাব বিস্তার করে তা আরো বাড়িয়ে দেয়।

মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে প্রমাণিত যে, তিনি (সা.) বলেছেন, ওয়ুর একটি শয়তান আছে, যার নাম ওলাহান। তার কাজ হলো, সে পানি অপচয় করায়। (তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাৎ, বাব কারাহিয়াতুল ইসরাফ ফিল ওয়ু)। এখানে মহানবী (সা.)-এর কথার অর্থ এটি নয় যে, প্রকৃতপক্ষেই অয়ুর কোনো শয়তান আছে, বরং তিনি (সা.) হৃদয়ের শঙ্কার নাম শয়তান রেখেছেন। শয়তানের কাজ হলো, খোদা তা'লা থেকে (মানুষকে) দূরে সরিয়ে দেওয়া, পানির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আর ওলাহান এর অর্থ হলো, এমন চিন্তাশীল যার একটি চিন্তা ছাড়া অন্য আর কোনো চিন্তাই থাকে না। এই অবস্থার নাম মহানবী (সা.) ওলাহান নামক শয়তান রেখেছেন। এই অবস্থার ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, মানুষের কোনো সম্বন্ধই থাকে না এবং অয়ুর সময় তার নামাযের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টির পরিবর্তে সে তার ব্যক্তিগত চিন্তায় মগ্ন থেকে পানি অপচয় করতে থাকে। নতুবা বাস্তবে শয়তান তাকে পানি অপচয় করতে বলে না, কেননা শয়তানের বেশি বা কম পানি অপচয়ে কী আসে যায়?

একইভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, নামাযেরও একটি শয়তান আছে যে নামাযের সময় কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করে যে, আমি যখন নামাযে দাঁড়াই তখন আমার হৃদয়ে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনা আসতে শুরু করে। তিনি (সা.) বলেন, এটি হলো শয়তান আর এর নাম “খানযাব” (মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বাব আত তা’উযু মিনাশ্ শায়তানিল ওয়াসওয়াসাতি ফিশ সালাতি)। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী (সা.) নামাযের শয়তানের নাম “খানযাব” বর্ণনা করেছেন। এটি ‘মুরাক্কাব’ বা যৌগ শব্দ যা খানা এবং আযীব এর সমন্বয়ে গঠিত। খানা অর্থ যুগের অবস্থা আর আযীব অর্থ হলো, দাহিয়া- অর্থাৎ, দুর্যোগ-সংকট এবং বিপদাপদ। আর মহানবী (সা.) এ কথাই বলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দৈব দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। মানুষ যদি পৃথিবীতে যতটা সম্ভব বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে সে এই অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে। মোটকথা, হৃদয়ের কুচিন্তাভাবনার নামও শয়তান রাখা হয়েছে।

ফেরেশতার প্রেরণা আর শয়তানের প্ররোচনা (মূলত) মানুষের হৃদয়ে বিরাজমান অবস্থারই ফলাফল হয়ে থাকে

এখন আমি এটি বলছি যে, শুরুতেই ফেরেশতা কিংবা শয়তানের প্ররোচনা সৃষ্টি হয় না। প্রথম প্রেরণা মন্দ হোক বা ভালো, তা মানুষের নিজের হৃদয় থেকেই সৃষ্টি হয়, কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, মানুষকে (সুস্থ) প্রকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রতিটি মানুষ পুণ্য-স্বভাবে সৃষ্ট। এরপর অবস্থা এবং সাহচর্যের কারণে তার হৃদয়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনার উন্মোচ ঘটে।

আর এসব চিন্তাভাবনাকে দৃঢ় করার জন্য যারা পুণ্যবান (তাদের কাছে) ফেরেশতারা চলে আসেন আর মন্দ লোকদের জন্য শয়তান চলে আসে। অতএব মহানবী (সা.) বলেন,

من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ*

(উচ্চারণ: মান কানা লাহু মিন ক্বালবিহী ওয়াইয়ুন কানা আলাইহে মিনাল্লাহে হাফেয়ুন- অনুবাদক) অর্থাৎ, যার হৃদয়ে সৎ চিন্তা সৃষ্টি হয়, আল্লাহ তা’লাও তার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিয়োগ দেন আর একই অবস্থা কুপ্ররোচনা (সৃষ্টির) ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। (অর্থাৎ) যার হৃদয়ে মন্দ চিন্তাভাবনা সৃষ্টি হতে থাকে তার ওপর শয়তান ভর করে। (*বৈরুত থেকে প্রকাশিত ইমাম গাযালী রচিত এহইয়াও উলুমুদ্দীন, ওয় খণ্ড, কিতাবু শারহে আজায়েবুল ক্বালবি বায়ানি মাজামিউ আওসাফিল ক্বালবি ওয়া আমসিলাতিহি)

অতএব বোঝা গেল, পাপ এবং পুণ্য প্রথমে মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। যদিও এর প্রেরণা বা প্ররোচনা বহিরাগত কারণে হয়ে থাকে। যদি পুণ্যের প্রেরণা হয় তাহলে ফেরেশতা তা (আরো) বৃদ্ধি করে আর যদি কুপ্ররোচনা হয় তাহলে শয়তান এমন মানুষের পিছু লেগে থাকে। নতুবা সূচনা থেকেই যদি বাহির থেকে নির্দেশনা আসত এবং হৃদয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক না থাকত এবং একে গ্রহণ বা বর্জনে তার কোনো ভূমিকা না থাকত তাহলে মানুষ নিরুপায় হতো। (কিন্তু বিষয়টি) এমন নয়, বরং “কুনাদ হাম জিনস বা হাম জিনস পারওয়ায” (অর্থাৎ সমশ্রেণির প্রাণী একসাথে বিচরণ করে বা ঝাঁকের কৈ ঝাঁকেই মিশে”- অনুবাদক) এই মূলমন্ত্র অনুযায়ী যখন হৃদয়ে পুণ্যের প্রেরণা জাগে তখন ফেরেশতার সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে আর যখন পাপের প্ররোচনা সৃষ্টি হয় তখন মন্দ-আত্মারা সম্পর্ক গড়ে তোলে।

অতএব এই দুটি প্রেরণা বা প্ররোচনা সম্পর্কে এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। অনেকে প্রশ্ন করে, আমরা কীভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করব? তাদের উত্তর হলো, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের উপায় হলো; মানুষের নিজের হৃদয়কে বিশ্লেষণ করতে থাকা। আধ্যাত্মিক উন্নতি হলো মানুষের উন্নত থেকে উন্নততর স্তর এবং পর্যায়সমূহের জ্ঞান অর্জিত হওয়া আর এর মাধ্যম হলো, মানুষের এটি লক্ষ্য করা যে, তার হৃদয়ে পুণ্যের প্রেরণা বেশি না কি মন্দের। যদি পুণ্যের প্রেরণা বেশি হয় তাহলে ধরে নিতে পারে যে, ফেরেশতার খোদা তাঁলার পানে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব মানুষ নিজের নামায, রোযা এবং নিজের চাঁদার ক্ষেত্রে কতটুকু উন্নতি করেছে সে দিকে না তাকিয়ে এটি দেখা উচিত যে, তার হৃদয়ে কীরূপ প্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে। তার হৃদয় তাকে অধিক নামায পড়ার, অধিক রোযা রাখার বা বেশি বেশি সৎকাজ করার নির্দেশ দেয় কি না? যদি হৃদয় (এই) আদেশ না দেয় তাহলে মানতে হবে যে, (সে) যা কিছু করছে তা কেবল প্রাথমিক চেষ্টাপ্রচেষ্টা বা অভ্যাসগত কাজ বা লোকদেখানো কাজ আর তা খোদার জন্য নয়। যদি পাঁচবেলার নামাযের স্থলে দশবেলাও পড়ে অর্থাৎ, পাঁচবেলার ফরযের পাশাপাশি নফলও পড়ে, কিন্তু তার হৃদয় নামায থেকে বিমুখ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, এখনো সে এমন পর্যায়ে পৌঁছে নি যে, ফেরেশতাদের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। বরং হতে পারে, সে এখনো প্রাথমিক চেষ্টাপ্রচেষ্টার পর্যায়েও পৌঁছে নি। বরং তার আত্মা প্রথাগত কিংবা অভ্যাসবশত অথবা লোক দেখানোর জন্য তাকে দিয়ে নামায পড়াচ্ছে। এখনো যদি তার আমল করার সৌভাগ্য না হয়, কিন্তু তার হৃদয়ে বিভিন্ন পুণ্যের প্রেরণা সঞ্চারিত হয় তাহলে সে ধরে নিতে পারে যে, ফেরেশতার তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। কাজেই, তোমরা নিজেদের নামায, রোযা প্রভৃতি মাধ্যমে নিজেদের অবস্থা যাচাই করো না, বরং তোমাদের হৃদয়ে যা কিছু আছে তা দেখো। যে-সব জাতির হৃদয় কলুষিত হয়ে

যায়, তারা বাহ্যত যতই শক্তিশালী হোক না কেন তারা অধঃপতিত হয়। রাশিয়াকেই দেখুন! কত বিশাল সাম্রাজ্য ছিল, কিন্তু এ সম্পর্কে যেহেতু হয়রত মসীহ মণ্ডুদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এ জন্য (সে অনুসারে) তাদের হৃদয় কলুষিত হয়ে পড়ে এবং এ কারণে তাদের গোটা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ বাহ্যিক অধঃপতনের স্বল্পকাল পূর্বেও এটিকে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য মনে করা হতো। অতএব কোনো মানুষের নামায, রোযা এবং যাকাতের আলোকে নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয় যে, আমি পুণ্য এবং তাকুওয়ার ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি করেছি। বরং নিজ হৃদয়ে যা কিছু রয়েছে এর আলোকে নিজের পুণ্য এবং তাকওয়ার মান যাচাই করা উচিত। যদি তার হৃদয়ে পুণ্যের প্রেরণা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে; ফেরেশতাদের প্রভাব বা ছায়া যা তার ওপর পড়ে, তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও সে এখন পর্যন্ত কিছু পাপ ছাড়তে পারে নি। আর যদি পাপের প্রতি আকর্ষণ তার হৃদয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে সে ভালো কাজ করলেও এটি বুঝতে হবে যে, শয়তানের সাথে তার সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব বেশি নামায পড়া অথবা বেশি রোযা রাখা ঈমানের লক্ষণ নয়। তোমাদের নিজেদের হৃদয়ে উঁকি মেরে দেখা উচিত এবং আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। তোমাদের সম্পর্কে মানুষের দায়িত্ব হলো, তোমাদের কর্ম বিশ্লেষণ করা আর তোমাদের কাজ হলো, নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করা।

ফেরেশতাদের অনুপ্রণা ও শয়তানি প্রেরণার মাঝে তুলনার রীতি

এখন আমি মোটাদাগে একটি কথা বলছি। কীভাবে বোঝা যাবে যে, তোমাদের (হৃদয়ে সৃষ্ট) প্রেরণায় শয়তানের হস্তক্ষেপ বেশি নাকি ফেরেশতার?

প্রথমে আমি উল্লেখ করেছি, প্রকৃত প্রেরণা— তা খারাপ হোক বা ভালোসেটি তোমাদের নিজেদের (ভেতরেই) সৃষ্ট, ফেরেশতা অথবা শয়তানের নয়। এ জন্য তোমাদের নিজেদের হৃদয়কে যাচাই করা উচিত এবং তা বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত যে, তোমাদের সাথে কার সম্পর্ক বেশি?

প্রথমত যদি তুমি দেখো যে, হৃদয়ে প্রথমে পুণ্য চিন্তা সৃষ্টি হয় এবং এরপর মন্দ, তাহলে বুঝে নিও, শয়তানের তুলনায় ফেরেশতার সাথে তোমার সম্পর্ক নিবিড়। ফেরেশতার নিজের সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে চায় কিন্তু শয়তান এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই যখনই কোনো কুচিন্তা মাথাচাড়া দেয় তখন যাচাই করে দেখো যে, এর পূর্বে তোমার হৃদয়ে পুণ্যের চিন্তা এসেছিল কি না? যদি এসে থাকে তাহলে ফেরেশতার সাথে তোমার সম্পর্ক শয়তানের তুলনায় অনেক বেশি।

উদাহরণস্বরূপ- তুমি নামায পড়ার জন্য এসেছ কিন্তু তোমার হৃদয়ে কুমন্ত্রণা বা কুধারণা জাগে, এতে বোঝা যায়, ফেরেশতার সাথে তোমার সম্পর্ক বেশি। তুমি পুণ্য করতে আসো অথচ শয়তান তা নষ্ট করতে চায়।

দ্বিতীয়ত যদি তুমি দেখো, যখন তোমার হৃদয়ে কোনো কুচিন্তা আসে তখন সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের চিন্তাও জাগ্রত হয় এ উদাহরণস্বরূপ- এই চিন্তার উদ্বেক হয় যে, মসজিদে যাই, লোকেরা দেখবে যে আমিও নামায পড়ি কিন্তু পরক্ষণেই এই চিন্তা আসে, নামায পড়লে তা শুধু আল্লাহর জন্যই পড়ব। এমতাবস্থায় বুঝে নিও যে, ফেরেশতাদের সাথে তোমার সম্পর্ক খুব একটা বেশি নয়; কিন্তু ফেরেশতারা তোমাকে একেবারে ছেড়েও যায় নি। যখনই তারা প্রয়োজন বোধ করে তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হয় যাতে পুণ্যের দিকে নিয়ে আসতে পারে।

এ পর্যন্ত মানুষ সুরক্ষিত থাকে কেননা, ফেরেশতারা তার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করে নি। প্রথম পর্যায়ে তো এমন ছিল যে, সে তাকে ওপরে ওঠাতো আর শয়তান তাকে নীচের দিকে টানত। দ্বিতীয়ত, তার নিমজ্জিত উপক্রম হলে ফেরেশতা তাকে উদ্ধার করত। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় রয়েছে সে-ও ধরে নিতে পারে যে, সে এরূপ পর্যায়ে রয়েছে যেখানে সে উন্নতি করতে পারে, নৈরাশ্যকর পর্যায়ে পৌঁছায় নি।

তৃতীয়ত তৃতীয় অবস্থাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর আর তা হলো, তুমি অনুভব করো, পাপের প্রেরণা হয় কিন্তু এর বিপরীতে পুণ্যের প্রেরণা জাগে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে থাকে কিন্তু হৃদয়ে এই কুপ্ররোচনার বিরুদ্ধে উত্তেজনা দেখা যায় না। অবস্থা যদি এমনই হয় তাহলে বুঝে নিও, ফেরেশতারা তোমাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছে এবং তুমি ষোলোআনাই শয়তানের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছ।

এই তিনটি পর্যায়ে হচ্ছে সেগুলো যেখানে পাপের প্রেরণা পুণ্যের সমান বা তার থেকে বেশি হয় এবং এদের মধ্যে একটি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে অনেক সচেতন হওয়া উচিত। এর ওপরে আরো দুটি পর্যায়ে রয়েছে যার মাঝে মানুষকে ফেরেশতার প্রেরণা এবং শয়তানের প্ররোচনার মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু ফেরেশতাদের সৃষ্ট প্রেরণা প্রাধান্য রাখে আর তা হলো,

(১) প্রথমে সং চিন্তাভাবনার সৃষ্টি হয়, এরপরে কুচিন্তার সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থা হলে বুঝে নেওয়া উচিত, যদিও ফেরেশতারা পুরোপুরি তার আশপাশে নেই কিন্তু মূল সম্পর্ক ফেরেশতাদের সাথেই রয়েছে, শয়তান শুধু মাত্র উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করছে।

(২) দ্বিতীয় অবস্থা হলো, পবিত্র চিন্তাভাবনা প্রথমে সৃষ্টি হয় এবং পরে মন্দ, কিন্তু মন্দ চিন্তাভাবনা খুবই কম সৃষ্টি হয় অথবা এমন যে, বিভিন্ন ধরনের পুণ্য প্রেরণার মধ্য হতে কোনো কোনো বিষয়ে হৃদয়ে ধারণার উদ্রেক হয় আর কতক বিষয়ে হয় না। এ অবস্থা সম্পর্কে জেনে রাখতে হবে, ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হচ্ছে এবং শয়তানের সাথে হচ্ছে শিথিল কিন্তু শয়তানের জন্য কোনো পথ অবশ্যই উন্মুক্ত রয়ে গেছে। এ অবস্থার যখন উত্তরণ ঘটে তখন সে শয়তানের আক্রমণ থেকে পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে যায়। এই পাঁচটি মাধ্যমের সুবাদে জানা যেতে পারে যে, মানুষ পাপে অধঃপতিত হচ্ছে নাকি পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করছে।

এখন এই প্রশ্ন দাঁড়ায়, মানুষের মধ্যে কোন্ প্রেরণাটি বেশি শক্তিশালী? ফেরেশতা সৃষ্ট প্রেরণা নাকি শয়তানের? আর মানুষের জন্য কোন্ পথটি বেশি উন্মুক্ত, ফেরেশতাদের পথ নাকি শয়তানের? এক্ষেত্রে এই প্রশ্নও জাগে যে, খোদা তা'লা মানুষের উন্নতির জন্য অধিক উপকরণ রেখেছেন নাকি পথভ্রষ্টতার জন্য? সুফিরা একটি ভুল করেছেন অথবা এটি বলা উচিত যে, তাদের দ্বারা টেকনিক্যাল অর্থাৎ, পরিভাষাগত ভুল হয়েছে, সত্যিকার অর্থে ভুল নয়। আর তা হলো, একটি বিষয়ের ভাব বা অর্থ বুঝতে তারা ভুল করেছে। সাধারণভাবে, বরং প্রত্যেকেই লিখেছেন, ফেরেশতার পথ একটিই আর মানুষের ভেতরে শয়তানের প্রবেশ করার অনেক পথ রয়েছে—এটি ভুল কথা। প্রথমত প্রকৃতির নিয়মের আলোকে এ কথাটি ভুল সাব্যস্ত হয়। এছাড়া পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি ভুল প্রমাণিত হয়। প্রকৃতির নিয়ম থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের হৃদয়ে বহিরাগত প্রভাবাদির কারণে বিভিন্ন ধ্যানধারণার উদয় হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—একজন মানুষের হৃদয়ে চুরির চিন্তা তখনই সৃষ্টি হয় যখন সে বাহিরে কোনো বস্তু দেখে; একই কথা অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর পাশাপাশি এটিও বোঝা যায়, যে-সব মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে মন্দ চিন্তার উদ্রেক ঘটে, সেসব মাধ্যমে পুণ্য চিন্তাভাবনার উন্মেষও ঘটে। উদাহরণস্বরূপ—দেখলে এ ধারণা জাগে যে, ‘অমুক জিনিস চুরি করা হোক’, তেমনিভাবে দেখার কারণেই এই মনোভাব হৃদয়ে জাগে যে, ‘অমুক গরিব, তাকে সাহায্য করা হোক’। একইভাবে কানের মাধ্যমে যেখানে একটি কথা শুনে বাজে চিন্তার উদ্রেক হতে পারে, সেখানে কানের মাধ্যমেই পুণ্যের চিন্তাও জাগে। একইভাবে স্পর্শ করা, দেখা ও স্বাদ নেবার (মাধ্যমেও) হয়ে থাকে। এথেকে বোঝা গেল, প্রত্যেক জিনিসই এমন যে, তার খারাপ ব্যবহারও করা যায় আবার ভালো ব্যবহারও করা যায়। সে কারণেই যে-সব মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে শয়তান ভেতরে প্রবেশ করতে পারে, সেসব মাধ্যমে ফেরেশতার প্রবেশ করে সৎ-প্রেরণাও সৃষ্টি করে।

এ ছাড়া পথদ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের তো অনেক পথ রয়েছে, কিন্তু (এর বিপরীতে) ফেরেশতাদের পথ একটিই এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের আলোকেও ভুল সাব্যস্ত হয়—

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ (আল-আন'আম: ১৫৪)

আয়াতটিকে ভুল বোঝার কারণে তারা ধোঁকা খেয়েছে।

খোদা তা'লা বলছেন, এটি আমার সরলসোজা পথ, এর অনুসরণ করো আর অন্যান্য পথের অনুসরণ কোরো না; সেগুলো তোমাদের ভুল পথে নিয়ে যাবে।

এথেকে বোঝা গেল, খোদার পথ একটিই, আর শয়তানের পথ অনেক। কিন্তু এই আয়াতের মর্ম বুঝতে তারা ভুল করেছে। প্রথমত খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনেই বলেছেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (আল-আনকাবূত: ৭০)

অর্থাৎ, যারা আমাদের পথে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে আমরা তাদেরকে বিভিন্ন পথ দেখাই।

এথেকে বোঝা গেল, পুণ্যেরও বিভিন্ন পথ রয়েছে। দ্বিতীয় উত্তর হলো, এই আয়াতে যে এক পথ ও বহু পথের কথা বলা হয়েছে, তার মাধ্যমে (মূলত) এ কথা বলা হয়েছে যে, খোদা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য বিভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই বরং শুধু মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেই মানুষ খোদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তবে হ্যাঁ, পরবর্তী ধাপে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ইসলাম অগণিত পথের কথা বলেছে। কাজেই, এই আয়াতে এ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, শয়তান যেভাবে পথদ্রষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে, (অর্থাৎ) কখনো সে খ্রিষ্টান হবার প্ররোচনা দেয়, কখনো আর্যসমাজী হবার, কোথাও আবার অন্য কোনো মিথ্যা ধর্ম গ্রহণ করার (কুপ্ররোচনা) দেয়— খোদা তা'লা এমনটি করেন নি। বরং খোদা তা'লা একটিই ধর্ম নির্ধারণ করেছেন, আর সেটি এমন ধর্ম যা সকল ধর্মের চেয়ে উত্তম।

এই বিষয়টি না বোঝার কারণে সুফিরা ভুল করেছেন। আসল বিষয় হলো, শয়তানের বিভ্রান্তিকর রীতির চেয়ে খোদা তা'লার দয়া অনেক বিস্তৃত। খোদা তা'লা বলেন, رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (আল-আ'রাফ: ১৫৭) অর্থাৎ, আমার দয়া সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

আমি এখন এই প্রশ্নে ফিরে আসছি যে, পুণ্যের প্রেরণা সৃষ্টিরও যদি অনেক মাধ্যম থেকে থাকে তাহলে জগতে শয়তান স্বভাবের মানুষ বেশি আর অন্যরা কম, এর কারণ কী? এথেকে তো এটিই প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাদের তুলনায় শয়তানের প্রভাব বেশি।

এ বিষয়ে স্মরণ রাখা উচিত, শয়তান ও ফেরেশতাদের সৃষ্টি প্রেরণা বা প্রভাবের তুলনা এভাবে করা উচিত নয় যে, ভালো মানুষ বেশি নাকি মন্দ মানুষ। বরং এভাবে (তুলনা) করা উচিত যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে পুণ্যের প্রেরণা বেশি থাকে নাকি পাপের। এ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, তুলনামূলকভাবে মানুষের অধিকাংশ কাজ মন্দের চেয়ে বেশি পুণ্যসমৃদ্ধ। আর মন্দ বেশি দৃষ্টিগোচর হবার কারণ হলো, তা ঘণ্যকর্ম হবার কারণে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এ জন্য মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘এক সময় সব মানুষ জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে’। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০২, টীকা)

এক ব্যক্তি যে চুরি করে, তাকে অপকর্মশীল ও অসাধু মানুষ বলা হবে। কিন্তু অন্য অনেক দোষত্রুটি হয়ত তার মাঝে থাকবে না, আর অনেক ভালো গুণাবলি তার মাঝে থাকতে পারে। হয়ত তার মাঝে অনেক পুণ্য থাকতে পারে আর (এর বিপরীতে) পাপ থাকলে কেবল একটি অর্থাৎ চুরি করা। এমন কোনো মানুষ পাওয়া যাবে না যার মাঝে মন্দ বেশি এবং এর বিপরীতে পুণ্য কম হবে। অতএব জগতে পুণ্য বেশি এবং পাপ কম হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু মন্দের প্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টি থাকে, এজন্য সেটা সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে যায়। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি কেউ এমন হয় যার শুধু নাক কাটা কিন্তু বাকি সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ নিখুঁত, তাহলে তার নাকের প্রতিই (সবার) দৃষ্টি পড়বে এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য কেউ দেখবে না। কাজেই, পুণ্যই বেশি হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষের দৃষ্টি মন্দের প্রতি (বেশি) পড়ে, তাই এটিকেই বেশি দেখানোর যোগ্য বলে জ্ঞান করা হয়।

ফেরেশতা হৃদয়ে কীভাবে প্রেরণা সঞ্চার করে আর তাঁর প্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যম কী— এখন আমি এটা বলছি তাঁর প্রেরণা সৃষ্টির বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। জানা যায়, মানুষ যখন কোনো সংকাজ করে তখন ফেরেশতা তার হৃদয়ে এই কাজের (প্রতি) অনুরাগ সৃষ্টি করে দেয়। আর যখন কোনো মানুষ সংকল্প করে যে, ‘আমি পুণ্যের এই পথ অবলম্বন করব’ তখন ফেরেশতা প্রত্যেকটি সুযোগেই এ বিষয়ে তাকে অবগত করতে থাকে যে, ‘সুযোগ এসে গেছে, এথেকে লাভবান হও’। এর অর্থ এই নয় যে, ফেরেশতা মানুষকে দিয়ে জোরপূর্বক এ কাজ করায়, বরং এর অর্থ হলো, সে তাকে অবগত করতে থাকে।

ফেরেশতার প্রেরণা সঞ্চারের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো, জ্ঞান বৃদ্ধি করতে থাকা। এর ফলে মানুষের (মাঝে) পুণ্য করার প্রেরণা সৃষ্টি হতে থাকে— ‘এটাও পুণ্যের কাজ, এটা করে নাও; এটাও পুণ্য, এর ওপর আমল করো’। কিন্তু পুণ্যের আসল উৎস হৃদয়ই হয়ে থাকে; এতেই ফেরেশতা আলোক ও প্রভাব সঞ্চার করে থাকে, আর এর কাজ হয় এই (সৃষ্টি) প্রেরণার অনুসরণ করানো। অর্থাৎ, ফেরেশতারা স্বয়ং মানুষকে দিয়ে পুণ্য করায় না, বরং পুণ্য করানোর জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করতে থাকে। এর উপমা হলো, একজন সম্মানিত ব্যক্তি অনেক মানুষের মধ্য দিয়ে যায় আর মানুষ তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতে থাকে; এর অর্থ এই নয় যে, ঐ লোকেরা তাকে পরিচালিত করছে। তিনি নিজেই হাঁটেন; তবে হ্যাঁ, তার চলার পথে ঐ লোকেরা সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করে দেয়। ফেরেশতারাও মানুষের জন্য এমন এমন মাধ্যম সৃষ্টি করে যাতে তারা অতি সহজে পুণ্য করতে পারে।

একইভাবে শয়তান কারো দ্বারা জোরপূর্বক মন্দ কাজ করায় না; বরং যখন কোনো ব্যক্তি একটি কুকর্মে লিপ্ত হয় তখন শয়তান তার সামনে আরেকটি রেখে দেয়, আর যখন দ্বিতীয়টি করে বসে তখন তৃতীয়টি (উপস্থাপন করে)। এভাবেই ক্রমান্বয়ে (অপকর্মে) এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ— হাঁটতে হাঁটতে কারো মাথায় চুরি করার অভিসন্ধি জাগে। এই চিন্তা (মাথায়) ঢোকান সাথে সাথে শয়তান তার মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করে যে, ‘অমুক ব্যক্তি সম্পদশালী’। মোটকথা, শয়তানের কাজ শুধু কুপরামর্শ দেওয়া; হৃদয়ের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভের সাধ্য তার নেই। তাই মানুষ যে পুণ্য বা পাপ করে তা তার নিজস্ব কর্ম হয়ে থাকে। ফেরেশতা বা শয়তান শুধু প্রেরণা সঞ্চার করে।

তৃতীয় মাধ্যমটি হলো, ফেরেশতা মানুষকে এমন স্থানে নিয়ে যায় যেখানে পুণ্যের প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তীতে এই প্রেরণা গ্রহণ করা মানুষের মনের ব্যাপার। এক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্ন জাগে আর তা হলো, মানুষ যখন ফেরেশতা বা শয়তানের পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করে, (অর্থাৎ) ফেরেশতা পুণ্যের বিষয়াদি বুঝিয়ে থাকে আর শয়তান মন্দ বিষয়াদি; তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, পাপ বা কুকর্ম করলে মানুষের কী দোষ? মনে নিলাম কুকর্ম মানুষ করেছে, কিন্তু শয়তানও তো এতে সাহায্য করেছে। এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত, শয়তানের প্রেরণা সঞ্চারে মানুষের দোষ হয় না, বরং এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সে অনুসারে কাজ না করলে তার পুণ্য হয়। তবে, এর ওপর আমল করলে পাপ হয়। কাজেই, মহানবী (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলে, ‘আমার মনে এমন এমন কুচিন্তা আসে যে, লজ্জায় মরে যাই। তা বলতেও আমার বিবেকে বাধে।’ {তিনি (সা.)} বলেন, ‘এটিই হলো ঈমানের আলো।’

তাই শয়তানের প্ররোচনা স্বয়ং পাপ নয়। যদি মানুষের হৃদয়ে কোনো কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয় আর সে তা বর্জন করে- তাহলে (সে) অপরাধী হবে না। অতএব পবিত্র কুরআন থেকেও (এটিই) জানা যায়; খোদা তা'লা বলেন,

(আল-বাকার: ২৮৫) وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

তোমাদের হৃদয়ে যা কিছু আছে তা তোমরা গোপন করো বা প্রকাশ করো- খোদা তোমাদের কাছ থেকে এর হিসাব নেবেন।

এখানে বলা হয়েছে, কোনো চিন্তার উদয় হলেই (তার জন্য) শাস্তি দেওয়া হবে- এমনটি নয়। বরং এটা যদি হৃদয়ে গেঁথে নাও কিংবা ছড়িয়ে দাও তাহলে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই, শয়তানের প্ররোচনাকে অন্যায় বলা যায় না, কেননা এর কারণে পাকড়াও করা হবে না। এমন কুপ্ররোচনা যদি সহস্রবারও হয় আর মানুষ এর শিকারে পরিণত না হয়, তাহলে (সে) পাপী হবে না; বরং তার পুণ্য হতে থাকবে।

এখন প্রশ্ন হলো- শয়তানের প্ররোচনা কীভাবে সৃষ্টি হয় আর কীরূপে শয়তান কুপ্ররোচনা দেয়? অতএব স্মরণ রাখা উচিত, যে মানুষ পুণ্যবান হয় আর যে নিজেকে শয়তানের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাখে না, বরং ফেরেশতার সাথেই তার সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকে- শয়তান তাকে পুণ্যকর্মের দোহাই দিয়েই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তবে, একবার যখন সেই (ব্যক্তি) শয়তানের খপ্পরে পড়ে যায়, তখন শয়তান তাকে মন্দকর্মে প্ররোচিত করে বিপথগামী করে। এর ব্যাখ্যা আমি পরবর্তীতে প্রদান করব। আপাতত শুধু এটুকুই বলছি, শয়তানের কুপ্ররোচনার দুটি শাখা রয়েছে- একটি হলো পুণ্যের, অপরটি পাপ বা মন্দকর্মের। এ সম্পর্কে (স্বাভাবিকভাবেই) প্রশ্ন উঠে যে, শয়তানও যেহেতু (মানুষকে) পুণ্যকর্মের প্রেরণা জোগায়, তাহলে প্রশ্ন হলো, মানুষের পক্ষে তার আহ্বান এড়িয়ে চলার উপায় কী? এমন তো হতে পারে- মানুষ কোনো পুণ্যকর্ম করে, কিন্তু দেখা গেল আসলে শয়তান তাকে দিয়ে সেই পুণ্যকর্মটি করিয়েছে। মন্দকর্মের বেলায় তো এটা জানা সম্ভব যে (কুপ্ররোচনাটি) শয়তানের কাজ, কিন্তু এটি কীভাবে জানা সম্ভব হবে যে, একটি পুণ্যকর্মও শয়তানের প্ররোচনার কারণে হতে পারে? শয়তান এবং ফেরেশতার প্ররোচনার মাঝে কী কী পার্থক্য রয়েছে- তা আমি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরছি।

প্রথমত এ বিষয়টি স্মরণ রেখো, ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সেই আহ্বানই করা হবে যার ফলাফল শুভ হবে। অনেক সময় একটি আহ্বান বাহ্যত ভালো মনে

হলেও তার ফলাফল মন্দ হয়ে থাকে, আবার অনেক সময় পুণ্যের আহ্বান হয়ে থাকে আর তার পরিণামও শুভ হয়। কাজেই, কোনো আহ্বানে সাড়া দেবার পূর্বে (এটি) চিন্তা করে নিও— এর পরিণাম মন্দ হবে না তো? দৃষ্টান্তস্বরূপ— এই পুণ্যকর্ম করার প্ররোচনা সৃষ্টি হয় যে, অমুক ভাই নামায পড়ে না, তাকে বোঝাও। কিন্তু বোঝাতে গিয়ে এই রীতি অবলম্বন করে বসল যে, অনেক মানুষের উপস্থিতিতে তাকে বলে বসল, ‘তুমি নামায পড়ো না তাই মুনাফেক হয়ে গিয়েছ, এই মুনাফেকী পরিত্যাগ করো’। এই আহ্বানটি পূত-পুণ্য আহ্বান ছিল, কিন্তু এত লোকের সামনে যখন তাকে এভাবে বলা হবে, এর ফলাফল এভাবে প্রকাশ পাবে যে, তখন সে নামাযকেই অস্বীকার করে বসবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) শোনাতেন, তাঁর (রা.) এক জামাতা ওহাবী ছিল। (একবার) তাঁর (রা.) সাথে সাক্ষাৎ করতে এক সম্ভ্রান্ত নেতা আসেন যার পায়জামার কাপড় গোড়ালির নীচে পর্যন্ত (ঝুলানো) ছিল। তাঁর (রা.) জামাতা সেই ব্যক্তির গোড়ালিতে মিসওয়াক ছুঁড়ে মেরে বলল, ‘তুমি এভাবে পায়জামা পরেছ তাই তুমি জাহান্নামী!’

একথা শুনে সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গালমন্দ করে বলল, ‘আমি আল্লাহ-রসূলই মানি না। এরা আবার কারা?’ হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) তাঁর জামাতাকে বললেন, ‘তুমি তাকে এমনই ভালো উপদেশই দিয়েছ যে; তাকে একদম কাফের বানিয়ে দিলে!’

মোটকথা, একটি প্রেরণা বাহ্যত পুণ্য মনে হলেও তার পরিণতি অশুভ হয়ে থাকে। এরূপ আহ্বান বা প্ররোচনা ফেরেশতার পক্ষ থেকে করা হয় না। ফেরেশতা সৃষ্ট প্রেরণাও সেটিই হবে যার পরিণামও শুভ হবে। ফেরেশতার আহ্বান যেহেতু আল্লাহ তা’লার প্রেরণার অধীনে হয়ে থাকে, তাই তা মন্দ পরিণতি নিয়ে আসতে পারে না। অতএব মনে কোনো প্ররোচনার সৃষ্টি হলে এটি যেমন যাচাই করে নেবে যে, এটি পুণ্যময় কি না। সাথে এ-ও ভেবে দেখবে যে, এর পরিণামও শুভ হবে কিনা। যদি ফলাফল মন্দ হয় তবে বুঝে নিও, এটি ফেরেশতার পক্ষ থেকে নয় বরং শয়তানের পক্ষ থেকে। হ্যাঁ, যদি পরিণাম শুভ হয় তবে তা ফেরেশতার পক্ষ থেকে হবে।

শয়তান ও ফেরেশতার সৃষ্ট প্রেরণার মাঝে তুলনা করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, ফেরেশতাদের সৃষ্ট প্রেরণার মাঝে তুলনামূলক (অধিক পুণ্যকর্মের দিকে) আহ্বান হয়ে থাকে, কিন্তু শয়তানের কুপ্ররোচনা এমন হয় না। শয়তান একটি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করায়, তবে তার দৃষ্টিপটে থাকে এর মাধ্যমে অধিক পুণ্যের কাজ ছাড়ানো। দৃষ্টান্তস্বরূপ— একদিকে বাজামা’ত নামায চলছে, ওদিকে মনে নফল নামায পড়ার ধারণা জাগে। অতএব বাজামা’ত নামায হারানোর তোয়াক্কা না করে

যদি নফল নামায পড়া হয়, তবে বুঝতে হবে এটি শয়তানের কুপ্ররোচনা; কেননা তুচ্ছ পুণ্যের খাতিরে বড়ো পুণ্য জলাঞ্জলি দিচ্ছে। স্যার সৈয়্যদ আহমদ সাহেবকে যখন প্রশ্ন করা হয়, আপনি নামায পড়েন না কেন? তখন তিনি বলেন, ‘আমি যে কাজ করছি এটাও ধর্মেরই কাজ।’ তার কাজকর্ম দেখে মনে হতো, তিনি এতে বিলীন হয়ে গেছেন। তাই একথা বলা যাবে না যে, তিনি এই কাজকে মন্দকর্ম জ্ঞান করে করতেন। আসলে পুণ্য মনে করেই করতেন, তবে তুচ্ছ পুণ্যের খাতিরে তিনি বড়ো পুণ্যকে বিসর্জন দেন। তাই তার এই কাজ ফেরেশতাদের সৃষ্ট প্রেরণা বলে গণ্য হতে পারে না।

বস্তুত কখনো কখনো শয়তানের আহ্বানও পুণ্যই হয়ে থাকে, কিন্তু বড়ো পুণ্যের কাজ ছাড়িয়ে ছোটো পুণ্যের কাজ করানো হয়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব নিজের একটি পারিবারিক ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তাদের বংশের একজন মহিলা অনেক বেশি আল্লাহর যিক্র করতেন এবং তার এক ভাই তাকে এরূপ করতে বারণ করতেন এবং বলতেন, (এর পরিবর্তে) বেশি বেশি নামায পড়ো। তিনি উত্তরে বলতেন, আমি এতে (অর্থাৎ যিক্র করে) অনেক তৃপ্তি পাই। তিনি (অর্থাৎ সেই ভাই) একথা শুনে বলতেন, এটি শয়তানের কুপ্ররোচনা; এভাবে শয়তান ক্রমান্বয়ে তোমাকে সুন্নত নামায এবং পরিশেষে ফরয নামাযও পরিত্যাগ করাবে। কিছুদিন অতিক্রান্ত হবার পর সেই বোন তার ভাইকে বললেন, সত্যিকার অর্থেই এখন এমনটি হচ্ছে যে; সুন্নত নামাযের স্বাদও হারিয়ে যাচ্ছে (তাই) আপনি এর চিকিৎসা বলে দিন। তিনি (অর্থাৎ সেই ভাই) তাকে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা’ পড়তে বলেন। অবশেষে সেই নারী দিব্যদর্শনে একটি বানর দেখতে পান যে বলে, আমি শয়তান; তুমি যদি ‘লা হাওলা’ না পড়তে আর তোমার ভাই তোমাকে (বিষয়টি) না বোঝাত, তাহলে আমি তোমাকে দিয়ে ফরয (নামায)ও পরিত্যাগ করাতাম।

সারকথা হলো, শয়তানের প্ররোচনা কখনো কখনো পুণ্যের মোড়কে উপস্থাপন করা হয় ঠিকই, তবে তাতে কোন পুণ্যের মর্যাদা কী তা দৃষ্টিতে রাখা হয় না। আল্লাহ্ তা‘লার প্রত্যেক বিধানে তুলনার বিষয়টি থেকে থাকে এবং প্রত্যেক বড়ো কিছুই খাতিরে ছোটো জিনিস বিসর্জিত হয়। কিন্তু যেখানে ছোটো জিনিসের জন্য বড়ো জিনিস হারিয়ে যেতে থাকে, সেখানে বুঝতে হবে এটি শয়তানের কুপ্ররোচনা।

কুমন্ত্রণা দেবার এ রীতি অনেক বেশি দেখা যায়। যেমন, কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, শিক্ষা বা তা‘লীম ব্যতিরেকে কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। এ কারণে প্রথমে তা‘লীম বা শিখানো প্রয়োজন, এরপর তবলীগের কাজে নামা উচিত। তাই যত অর্থ আসবে পুরোটাই তা‘লীমের পেছনে ব্যয় করা উচিত। এই প্রশ্নের উত্তরদাতা একথা

বলতে পারবেন না যে, তা'লীম বা শিক্ষাদীক্ষা ভালো জিনিস নয় তাই এর আয়োজন করা উচিত নয়' এ কারণে স্বভাবতই সে একথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, এটি একটি শয়তানি কুমন্ত্রণা, কেননা জ্ঞান সৌন্দর্য বর্ধনস্বরূপ যা ধর্মসেবার জন্য একটি বাড়তি বিষয়। নিঃসন্দেহে এ দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু সবকিছু এর পেছনে ব্যয় করার বিষয়টি এমনই, যেমন দশজন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাবার রান্না করার সাজসরঞ্জাম দিয়ে (কেবল মাত্র) একজনের জন্য পোলাও রান্না করে অন্য সবাইকে অনাহারে মরতে দেয়া। একজনকে অভিজাত খাবার খাওয়ানোর চাইতে দশজনকে জীবিত রাখার ব্যবস্থা করা অধিক উত্তম। অতএব শিক্ষাখাতে সম্পূর্ণ অর্থ ও পুরো শ্রম দেবার চেয়ে মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিয়ে দেবার চেষ্টা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এই মহৎ কাজকে (যেন) তুচ্ছ কাজের জন্য পরিত্যাগ করা না হয়, নতুবা বড়ো ও ছোটো কাজের মাঝে তুলনা থাকবে না। তুলনা করার বিষয়ে মহানবী (সা.) নিতান্তই সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁকে (সা.) প্রশ্ন করা হয়, হারাম আর হালাল বস্তু চেনার উপায় কী? {তিনি (সা.) উত্তরে} বলেন,

* الإثم ما حاك في صدرك (উচ্চারণ: আল্‌ইসমু মা হাকা ফী সাদরিকা) অর্থাৎ, নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন করা উচিত। সারা পৃথিবীর মৌলভীরাও যদি বলতে থাকে যে, অমুক বিষয়টি অবৈধ কিন্তু অন্তর ফতোয়া দেয় বা সাক্ষ্য দেয় যে তা বৈধ, তবে সেটি বৈধ হবে। এটি সেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যে-সব বিষয়ে বৈধ বা অবৈধ হবার শরীয়ত সিদ্ধান্ত দিয়ে রেখেছে। বরং (এটি) সেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুণ্যকর্ম মনে হয়, আবার কোনো কোনো আঙ্গিকে পাপ মনে হয়। এমন কোনো বিষয় করতে যদি মন সায় না দেয়, তবে (তা) করবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ যিক্র এর বিষয়ে যদি কোনো মৌলভীকে প্রশ্ন করা হয় তবে সে বলবে, (যিক্র) উত্তম। তবে (যিক্র এর জন্য) সে যদি নফল নামায পরিত্যাগ করতে বলে, এটি হবে তার নিজের মনগড়া বক্তব্য। এ বিষয়ে তার হৃদয়ই সিদ্ধান্ত দিতে পারবে। অথবা কেউ যদি বলে, কারো আদর-আপ্যায়ন করা বা কাউকে উপহার দেওয়া কেমন কাজ? একজন আলেম এই উত্তরই দিবেন যে, (এটি) ভালো কাজ। কিন্তু সে (অর্থাৎ প্রশ্নকারী) যদি উপহার বলতে নিজ মনে ঘৃণ বা ফলের ঝুড়ি অর্থ করে, তবে (উপহার বৈধ হওয়া সম্পর্কে) ফতোয়া এসে গেছে কিন্তু ফতোয়া নেবার সময় তার যে অভিপ্রায় ছিল তা তার অন্তরই জানে। সে

* মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২২৭

সময় তাকে তার বিবেকের কথাই গ্রহণ করা উচিত, যা বলতে থাকবে যে, এটি অবৈধ। (এক্ষেত্রে) ফতোয়া মানা উচিত নয়।

কাজেই, মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি কেউ কোনো বিষয় বৈধ হওয়া সম্পর্কে ফতোয়াও প্রদান করে যে, অমুক কর্মটি তুমি কর, কিন্তু হৃদয়ে যদি সেই কর্মের কোনো মন্দ দিক সামনে আসে তাহলে সেটি করা উচিত নয় এবং (তা) পরিত্যাগ করা উচিত।

ফেরেশতা ও শয়তান সৃষ্ট প্রেরণার মাঝে তৃতীয় পার্থক্য হলো, ফেরেশতার প্রেরণার মাঝে একটি শৃঙ্খল বজায় থাকে, (তা) ক্রমান্বয়ে উন্নতি করে। এর দৃষ্টান্ত এমনই যেমন প্রথম দিকে মা তার সন্তানকে কোলে নিয়ে হাঁটেন। এরপর হাত ধরে হাঁটান এবং ধীরে ধীরে বাচ্চা হাঁটতে শিখে যায়। কিন্তু শয়তানি কুপ্ররোচনার উদাহরণ হবে, শত্রুর শিশুকে তুলে নিয়ে ফেলে বইকি। কিংবা ফেরেশতা ও শয়তানের প্রেরণার উদাহরণ এমন যে, যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শুভাকাঙ্ক্ষী, তিনি তাকে ক, খ থেকে পড়ানো শুরু করবেন এরপর পর্যায়ক্রমে উন্নতির সোপান অতিক্রম করাবেন। কিন্তু শিক্ষক যদি শত্রু হয় তাহলে প্রথমেই এমন কঠিন পাঠ দেওয়া আরম্ভ করবে যে, ছাত্র বিরক্ত হয়ে চলে যাবে। অতএব ফেরেশতার প্রেরণা ক্রমান্বয়ে হবে, হঠাৎ কোনো বিষয়ের বোঝা মানুষের ওপর এসে পড়বে না আর কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়া করানো হবে না। কিন্তু যদি এমনটি না হয়, বরং দেখা যায় যে অকস্মাৎ কোনো বোঝা (মানুষের ঘাড়ের) চেপে বসেছে এবং তাড়াহুড়া করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তবে বুঝতে হবে এটি ফেরেশতার (আহ্বান) নয় বরং শয়তানের কুপ্ররোচনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ- শয়তান এভাবে কুপ্ররোচনা দিয়ে বলবে, আজই তুমি ওলী বা পুণ্যবান হয়ে যাও। আর এ জন্য সারাদিন নামায পড়ো এবং পুরো বছর রোযা রাখো। কিন্তু কেউ যদি এটি বাস্তবায়ন করে তাহলে এর ফলাফল যা দাঁড়াবে তা হলো, সে বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে নামায ও রোযা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে। এ কারণেই মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন, কোনো কোনো সাহাবী সারারাত তাহাজ্জুদ নামায পড়েন এবং দিনে রোযা রাখেন, তখন তিনি (সা.) বিষয়টি পছন্দ করেন নি এবং বলেন, ‘এভাবে তোমরা অন্যের প্রাপ্য অধিকার হরণ করছ, এটি পুণ্যকর্ম নয়’।*

মানুষ ক্রমাগতভাবে কাজ করবে-এটিই পুণ্য। প্রথম এক, এরপর দ্বিতীয় এবং তারপর তৃতীয় পদক্ষেপ নেবে- এটি হলো ফেরেশতা কর্তৃক সৃষ্ট প্রেরণার লক্ষণ।

* বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাব মা ইয়াকরাহু মান তারাকা কেয়ামাল্ লাইলি লিমান কানা ইয়াকুমুহ।

পক্ষান্তরে শয়তানি প্ররোচনা এক ঝটকায় সব কাজ করাতে চায়। উদাহরণস্বরূপ— এক ব্যক্তি যে-কিনা পূর্বে কখনো ধর্মের খাতিরে আর্থিক কুরবানী করে নি তার মনে প্রেরণা জাগে যে, আমি আগামী মাসে আমার সমস্ত সম্পদ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেবো। এটি যেহেতু তার প্রকৃত বাসনা হবে না তাই (সম্পদ) দিয়ে দেবার পর তার মনে এক প্রকার অনুশোচনা সৃষ্টি হবে। আর অনুশোচনা সৃষ্টি হতেই শয়তান তাকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে এবং তাকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।

অতএব শয়তানি প্ররোচনা যেভাবে প্রকাশ পায় তা হলো, সে (মানুষকে) তুরাপরায়ণতার পানে ধাবিত করবে আর হঠাৎ করে অনেক বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। প্রথমে তার হৃদয়ে এ প্ররোচনা জোগাবে যে, আজকেই তুমি খোদার সাথে মিলিত হয়ে যাও, বাস্তবে যখন তা সম্ভব হবে না তখন তা মানুষের মনে হতাশা সৃষ্টি করবে। এমন অনেকে রয়েছে যারা সপ্তাহ খানেক নামায পড়েই বলে বসে, আমরা তো খোদাকে পেলাম না। আবার অনেক মানুষ এমনও আছে যারা অল্প কিছুদিন নামায পড়েই মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে অথচ এগুলো সবই শয়তানি কুপ্ররোচনা হয়ে থাকে। (আসল কথা হলো) মানুষ যখন খোদা তা'লা এবং মহানবী (সা.)-এর দর্শন লাভের যোগ্য হবে তখন তারা দেখতে পাবে। যোগ্যতা ছাড়া দেখা কীভাবে সম্ভব হতে পারে! কাজেই, এ ধরনের তুরাপরায়ণতা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর এর পরিণাম যা সামনে আসে তা হলো, মানুষ যখন প্রত্যাশিত ফল না পায় তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং সব কাজ ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে যায়।

চতুর্থ পার্থক্য হলো, কোনো আদেশে যদি সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়াদি থাকে অর্থাৎ, যেগুলো সম্পর্কে ধারণা হয় যে, এগুলো ভালোও হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে; এ সম্পর্কে যখন ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে প্রেরণা সৃষ্টি হবে, তা এমন হবে যে, সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা হোক এবং সেগুলো আমলে না নেওয়া হোক। কিন্তু এগুলো করতে অসুবিধা কী, করা হোক— এমনটি হলো শয়তানি প্ররোচনা। এভাবে তাকে দিয়ে সেগুলো করিয়ে নেয় এবং একবার তাকে দিয়ে তা করিয়ে নেবার পর সেটিকে একটি (আধ্যাত্মিক) ধাপ বা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান আখ্যা দেয় আর তৎপরবর্তী বিষয়াদিকে লক্ষ্য নির্ধারণ করায়। এরপর সে অগ্রসর হয় সীমারেখায় কাজ করিয়ে সেটিকে একটি ধাপ বা মর্যাদার স্থান বানিয়ে দেয়। এভাবে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে এবং আর বড়ো বড়ো পাপ করিয়ে নেয়।

অতঃপর আরেকটি পার্থক্য রয়েছে আর তা হলো, ফেরেশতা কর্তৃক সৃষ্ট প্রেরণা সেটি, যখন মানুষ তাতে নিমগ্ন হয়, তাতে তাকে উন্নতি দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ- নামাযরত থাকলে আরো সুন্দরভাবে নামায পড়ার প্রেরণা সঞ্চারিত হবে। পক্ষান্তরে শয়তান সৃষ্ট প্ররোচনায় মানুষ কোনো কাজে মগ্ন থাকলে তা থেকে সরিয়ে অন্য কাজ করানো হবে। এ কাজের পেছনে শয়তানের মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, এক ব্যক্তি যে পুণ্যকর্ম করছে তা থেকে তাকে প্রথমে বিমুখ করো। এ কাজ ছেড়ে অন্য কাজে মনোনিবেশ করলে তখন আবার দেখা যাবে।

ষষ্ঠ পার্থক্য হলো, কখনো আবার শয়তানি প্ররোচনার ধরন হলো, মানুষের নিকট অন্যের দোষত্রুটি ও দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ফেরেশতা কর্তৃক পরিচালিত মানুষেরা (সর্বদা) অন্যের সম্পর্কে সুধারণাই পোষণ করবে, কেননা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সুধারণা পোষণের প্রেরণাই সঞ্চার করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, শয়তানি কুপ্ররোচনায় অন্য লোকদের দোষত্রুটি প্রকাশ করা হয় আর এভাবে (হৃদয়ে) এই ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে, অমুকের মাঝে এই দোষ রয়েছে তমুকের মধ্যে এই ত্রুটি রয়েছে কিন্তু আমি অনেক বড়ো ওলী।

খ্রিষ্টানদের মতো, যেমনটি তারা বলে, ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.), দাউদ (আ.) সর্বোপরি সব নবীই পাপী ছিলেন বিধায় মসীহ (আ.)-এর মর্যাদা তাদের চেয়ে উন্নত। কিন্তু এ দৃষ্টান্তটি এমনই যেভাবে কেউ বলে, অমুক অমুক মৃতব্যক্তির চেয়ে আমি বেশি শক্তিশালী। শয়তান এমন ধ্যানধারণাই সৃষ্টি করে অর্থাৎ মানুষকে তাচ্ছিল্যের সাথে অন্যের দৃষ্টিতে অপদস্থ দেখিয়ে এমন কুধারণারই উদ্বেক ঘটায় যে, মুই কী হনুরে! আর এভাবে আত্মশ্লাঘা ও অহংকার সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

সপ্তম পার্থক্য হলো, কখনো কখনো এমনও হয় যে, দুটি পুণ্যকর্মের মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য দৃষ্টিতে থাকে না অর্থাৎ কখনো এমন হয় যে, ছোটো পুণ্যের জন্য বড়ো পুণ্যকে ত্যাগ করে বসে। আবার কখনো এমন হয় যে, পুণ্যকর্ম তো একই ধরনের হয়ে থাকে কিন্তু সে (শয়তান) এক দিকেই তাকে রাখে, একটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে আর অন্যান্য পুণ্য একেবারেই ছাড়িয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ- যে ব্যক্তি তবলীগ করে শয়তান তাকে বলবে, তোমার চাঁদা দেবার কী প্রয়োজন একটি কাজ তো করছোই। অথবা যে চাঁদা দেয় তাকে বলবে, যেহেতু তুমি চাঁদা দিচ্ছ তাই তবলীগ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ফেরেশতা একথাই বলে যে, তবলীগ করাও পুণ্য কাজ (তাই) এটিও করো এবং চাঁদা দেওয়াও পুণ্যের কাজ (তাই) চাঁদাও দাও।

অষ্টম বিষয়টি খুবই ভয়ংকর আর তা হলো, মানুষ যখন কোনো সৎকর্ম করতে আরম্ভ করে, আর এমন মানুষ উঁচুমানের নয় বরং নিম্নপর্যায়ের হয়ে থাকে, তখন শয়তান তার হৃদয়ে এই কুধারণা সৃষ্টি করে যে, মানুষ বলবে, সে লোকদেখানোর জন্য এ কাজ করছে তাই এটি করাই উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ- এমন মানুষ যখন নামায পড়ার জন্য মসজিদে যেতে চাইবে তখন শয়তান তার হৃদয়ে এই ধারণার উদ্রেক ঘটাবে যে, লোকেরা তোমাকে দেখে বলবে, এ-ও নামাযী! ফলে এটি লোকদেখানো কাজে রূপ নেবে তাই মসজিদে যাওয়াই উচিত নয়। এভাবে শয়তান বাজামা'ত নামায থেকে (তাকে) বিরত রাখবে কিন্তু ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে যে প্রেরণা সৃষ্টি করা হয় তাতে সর্বদা শরীয়তের সম্মানকে দৃষ্টিগোচর রাখা হয়।

এ ধরনের শয়তানি কুমন্ত্রণার ক্ষেত্রে মু'মিনদের নিজেদের নফসকে উদ্দেশ্য করে বলা উচিত, মানুষ যা ইচ্ছে বলুক, আমি শরীয়তের আদেশ অবশ্যই পালন করব। আর এ ধরনের কোনো কথায় ভ্রক্ষেপ না করে বরং যা আল্লাহ তা'লার আদেশ তা পালন করা উচিত।

একথা খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, মু'মিনের রীতি হলো, এহেন পরিস্থিতিতে এই সাবধানতা অবলম্বন করা- যেই পুণ্যকর্মের প্রতি তার মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না তাকে শয়তানি প্ররোচনা মনে করতে হবে, আর এমন বিষয়ে আরো বেশি জোর দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ- একজন চাঁদা দেয় কিন্তু তবলীগ করে না এবং ধারণা করে, তবলীগ করা আবশ্যিক নয়; এমতাবস্থায় তবলীগের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। যেমন, পড়ালেখায় ছাত্ররা যে বিষয়ে দুর্বল থাকে সেটির প্রতি বেশি বেশি মনোযোগ দেয়। একইভাবে তোমরাও যে পুণ্যকর্মে নিজেদের দুর্বলতা খুঁজে পাবে সেটির প্রতি বেশি জোর দেবে আর এতে যে ঘাটতি রয়েছে তা পূর্ণ করে।

শয়তানি কুপ্ররোচনা থেকে বাঁচার উপায় কী- তা এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

শয়তান যখন কোনো পুণ্যকর্ম করার আহ্বান জানায় এবং এর উদ্দেশ্য হয় কেবল কোনো বড়ো পুণ্যকর্ম পরিত্যাগ করিয়ে পাপকর্ম করানো তখন এমন ক্ষেত্রে (উভয়ের মাঝে) তুলনা করে দেখা উচিত। আর শয়তান যে পুণ্যকর্ম থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছে তা-ও করা উচিত এবং যে পুণ্য করার আহ্বান জানাচ্ছে সেটিও করা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ- যিক্র করার ক্ষেত্রে মানুষের দুর্বলতা রয়েছে। শয়তান এটির প্রতি আহ্বান জানালে এটিও করুন, পাশাপাশি ফরয ইবাদতের ক্ষেত্রেও ঘাটতি

সৃষ্টি হতে দেবেন না, সেগুলোও পূর্ণরূপে আদায় করুন। এমনটি করলে শয়তান নিরাশ হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে এমন প্ররোচনা সৃষ্টির সাহস দেখাবে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ ঘটনাটি শুনাতেন। একবার সকালে হযরত মুআবিয়া (রা.)'র ঘুম ভাঙে নি আর ঘুম ভাঙার পর নামাযের সময় পার হয়ে যাওয়ায় তিনি সারাদিন কাঁদতে থাকেন। পরের দিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, এক ব্যক্তি এসে তাঁকে নামাযের জন্য জাগাচ্ছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? সে বলল, আমি শয়তান। তোমাকে নামাযের জন্য জাগাতে এসেছি। তিনি বললেন, নামাযের জন্য জাগানোর সাথে তোমার কী সম্পর্ক? ব্যাপার কী? সে বলল, গতকাল আমি তোমাকে ঘুমিয়ে থাকার জন্য প্ররোচিত করেছিলাম আর তুমি ঘুমিয়ে থাকার কারণে (সময়মত) নামায পড়তে পারো নি এবং সারাদিন কান্নাকাটি করেছ। (এটি দেখে) আল্লাহ তা'লা বলেন, তাকে বাজমা'ত নামায পড়ার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি পুণ্যের ভাগী করো। নামায থেকে বঞ্চিত রাখার কারণে তুমি আরো বেশি সওয়াব পেয়ে গেলে— এতে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। আজকে আমি তোমাকে এজন্য জাগাতে এসেছি যাতে আজও আবার তুমি বেশি সওয়াব না পেয়ে যাও।

অতএব শয়তান তখনই পিছু ছাড়ে যখন মানুষ তার কথার খণ্ডন উপেক্ষা করে। এর ফলে সে নিরাশ হয়ে চলে যায়। ইসলাম ধর্মে এটি প্রমাণিত সত্য যে, শয়তান নিরাশ হয়।*

এখন আমি বলে দিচ্ছি, কীভাবে শয়তানের কুপ্ররোচনাকে মানুষ পুণ্যকর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে এবং তা পুণ্যকর্মে রূপ নেয়?

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, শয়তানি প্রভাব দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো, সাধারণ প্রভাব। যেমন, কুচিন্তা সৃষ্টি করা; যার প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়ে থাকে। এমন চিন্তাধারার প্রভাব আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের ওপর এমনকি মহানবী (সা.)-এর ওপরও পড়বে। পরবর্তীতে সেটি কেউ গ্রহণ করবে কিনা তা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু প্রভাব অবশ্যই পড়বে।

[*টীকা: হযরত কারো হৃদয়ে এই সন্দেহের উদ্বেক হতে পারে যে, ফেরেশতারা তো আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে তা মানুষের কাছে পৌঁছায়। (কিন্তু) শয়তান কার কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করে এবং মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে? অতএব এর উত্তর হলো, অপরকে দেয়ার জন্য ভাণ্ডার এবং কোষাগারের প্রয়োজন কিন্তু ছিনতাইকারীর কোনো ভাণ্ডারের প্রয়োজন হয় না। শয়তানের কাজ যেহেতু কাউকে কিছু প্রদান করা নয় বরং ছিনিয়ে নেওয়া তাই তার কোনো ভাণ্ডার কিংবা কোষাগারের প্রয়োজন নেই আর সে কারো কাছ থেকে কল্যাণমণ্ডিতও হয় না।]

দ্বিতীয়টি হলো, বিশেষ প্রভাব যা কেবল তাদের ওপরই পড়ে যারা শয়তান থেকে সুরক্ষিত নয় কিংবা তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

এই উভয় প্রকার প্রভাব যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, সে সুরক্ষিত থাকে না এবং যে গ্রহণ করে না, সে তার দ্বারা উপকৃত হয়। শয়তান কুপ্রভাব ফেলে কিন্তু মানুষ সেটিকে পুণ্যকর্মে রূপান্তরিত করে নেয়, আর শয়তানের কাছ থেকে কুশিক্ষা লাভের পরিবর্তে তার মাধ্যমে পুণ্যকর্ম করিয়ে নেয়। এর উপায় হলো, শয়তানের হামলা আবেগের মাধ্যমে হয়ে থাকে। শয়তান তাকে উসকে দেয় ফলে সে মন্দকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ যদি স্থায়ী ইচ্ছাশক্তি প্রবল করে তাহলে সংকল্প যত শক্তিশালী হবে ততই সে পুণ্যকর্মে উন্নতি করবে। সংকল্প দুর্বল হলেই মানুষের ওপর শয়তানি কুপ্ররোচনার প্রভাব পড়ে। উদাহরণস্বরূপ— অবৈধ কামনা-বাসনার উদ্বেক ঘটে কিংবা ধনসম্পদের মোহ সৃষ্টি হয়। ইচ্ছাশক্তি যদি দুর্বল হয় তাহলে সে এসব আবেগের অন্যায় ব্যবহার করবে। তবে ইচ্ছাশক্তি যদি দৃঢ় হয় তাহলে সে আবেগকে স্থানকালপাত্রভেদে উত্তমরূপে ব্যবহার করবে। অতএব ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করার মাধ্যমে মানুষ শয়তানের কুপ্ররোচনাকেও ভালো কাজে রূপান্তরিত করতে পারে। যেমন, মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘আমি এমনটিই করে থাকি’।

একবার মহানবী (সা.) সাহাবীদের (রা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার পেছনে শয়তান লেগে নেই। সাহাবীরা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এটি কি আপনার বেলায়ও প্রযোজ্য? আপনি তো নিরাপদ? {তিনি (সা.)} বলেন, হ্যাঁ, আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিন্তু খোদা তা’লা আমাকে শক্তি দিয়েছেন এবং আমি শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছি। সে আমাকে যখনই কোনো শিক্ষা দেয় তখন তা মন্দকর্মের নয় বরং পুণ্যকর্মেরই দিয়ে থাকে। /মুসলিম, কিতাব সিফাতিল কেয়ামাতি ওয়াল জাম্মাতি ওয়ান্ নার, বাবু তাহরিগুশ্ শায়তান ওয়া বা’সাহ্ সারায়াহ্ লিফিতনাতুন্ নাসি ওয়া ইন মা’য়া কুল ইনসানি কারিনান।

এই হাদীসের অর্থ এটি নয় যে, প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক শয়তান নিযুক্ত আছে এবং মহানবী (সা.)-এর শয়তান পুণ্যকর্মের প্রতি আহ্বান জানানো। যদি সে পৃথক সত্তা হতো এবং মন্দকর্মের পরিবর্তে পুণ্যকর্মের দিকে আহ্বান জানানো শুরু করে দিয়ে থাকত তাহলে সে শয়তান কীভাবে হলো, সে তো ফেরেশতা হয়ে গেল। অথবা যদি বলো, সে প্রথমে শয়তান ছিল কিন্তু যখন থেকে পুণ্যকর্মের প্রেরণা জোগানো আরম্ভ করল ফেরেশতা হয়ে গেল, তাহলে এটিও ভুল কেননা মহানবী (সা.) তার পুণ্যকর্মের প্রতি আহ্বান জানানোর কথা বলার সময়ও তাকে শয়তানই বলেছিলেন। যদি এর এই উত্তর দেওয়া হয় যে, মহানবী (সা.) তার

পূর্বেকার অবস্থার কারণেই তার নাম শয়তান রেখেছেন- তবে এর উত্তর হলো, সে যদি (প্রকৃত অর্থেই) শয়তানি করা ছেড়ে দিয়ে থাকে তবে এই মহান প্রভাব তার ওপর পড়েছিল মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে। যেহেতু তিনি (সা.) নিজে বলেছেন; ‘সাল্লাতানী’ অর্থাৎ আল্লাহ তা’লা আমাকে তার ওপর আধিপত্য দান করেছেন। কাজেই, তার ইসলাম ছিল মহানবী (সা.)-এর কারণে। তাহলে সে মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে পুণ্যকর্মের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির যোগ্যতা কীভাবে লাভ করল? যদিও মহানবী (সা.) বলেছেন, সে আমাকে পুণ্যকর্মের অনুপ্রেরণা যোগায়।

অতএব এসব অর্থ প্রকাশ্য ভুল বরং এর অন্য অর্থ রয়েছে আর তা হলো, শয়তানের সাধারণ যে মন্দ প্রভাব মানুষের ওপর পড়েছে এবং যা থেকে কেউ নিরাপদ থাকতে পারে না সেগুলো সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, শয়তানের এমন কোনো প্রভাব যখন আমার ওপর পড়ে তখন তা পুণ্যকর্মে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এর দৃষ্টান্ত সেই নোংরা পানির ন্যায় যা ফিল্টারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর ওপর যে-সব মন্দ প্রভাব পড়ে তা তাঁর মাধ্যমে পুণ্য হয়ে যায়। অথবা এর দৃষ্টান্ত আখ মাড়াই করার যন্ত্রের ন্যায়। এতে আখ প্রবেশ করালে একদিক থেকে রস নির্গত হয় এবং অন্যদিকে ছোবড়া আলাদা হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন কোনো অপবিত্র বিষয় আসত, (তখন) এর অপবিত্রতা পৃথক হয়ে যেত এবং পুণ্য (বিষয়াদি) অবশিষ্ট থেকে যেত আর এর নামই তিনি (সা.) রেখেছেন, ‘আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গিয়েছে’ অর্থাৎ শয়তানি কুপ্ররোচনারও ভালো ব্যবহার করা যায়।

এখন আমি শেষকথা বলছি আর তা হলো, ফেরেশতার সৃষ্ট প্রেরণা কীভাবে দৃঢ় করা যায়? এ জন্য দেখতে হবে, প্রাকৃতিক বিধানে প্রতিটি জিনিস বৃদ্ধি করার আসল উপায় বা নিয়ম কী? কিছুটা অভিনিবেশ করলেই বোঝা যাবে, সেই নিয়মটি হলো, সেটিকে উত্তমরূপে ব্যবহার করা। লক্ষ্য করুন! যারা প্রথমে অল্প অল্প করে আর্সেনিক খেতে আরম্ভ করে (তারা) একপর্যায়ে গিয়ে তোলা-তোলা পরিমাণ বিষ খেয়েও হজম করতে সক্ষম হয়। অন্য কেউ যদি এর সামান্য পরিমাণ বিষও খায় তবে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। কিন্তু তারা যেহেতু বৃদ্ধি করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাই তাদের কোনো ক্ষতি হয় না। দৈহিক শক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যারা হাত দিয়ে কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ করে তাদের হাত মোটা ও শক্ত হয়ে যায়। (আবার) যারা বেশি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলে, তারা ৪-৫ জনের খাবার একাই খেয়ে ফেলে। অতএব যে জিনিস যত বেশি ব্যবহৃত হবে তা ততই বৃদ্ধি পাবে আর ফেরেশতাদের সৃষ্ট প্রেরণার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মানুষ

যত বেশি তাদের সৃষ্ট প্রেরণায় সাড়া দেবে এবং তা ব্যবহার করবে, তত বেশি তারা ফেরেশতাদের প্রেরণা আকর্ষণ করতে পারবে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, দৈহিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে তো এমনটি হয়ে থাকে যে, কেউ বেশি খেতে অভ্যস্ত হলে ৪/৫ জন কিংবা খুব বেশি হলে ৮/১০ জন মানুষের খাবার খেয়ে ফেলতে পারবে, কিন্তু (কখনো) একশ' বা এক হাজার মানুষের খাবার খেতে পারবে না। ফেরেশতাদের সৃষ্ট প্রেরণার ক্ষেত্রেও এরূপ কোনো সীমারেখা নির্ধারিত আছে কি যে, এর বেশি (মানুষ তা) গ্রহণ করতে পারবে না?

স্মরণ রাখতে হবে, এ ধরনের তুলনা করা যথার্থ নয়, কেননা মানবদেহ স্বল্প দিনের মাত্র। আর দেহ এবং আত্মার তুলনার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান বিষয়ের তুলনা হয় মাত্র, পূর্ণাঙ্গীন তুলনা নয়। দেহ যেহেতু ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে তাই এর শক্তিসামর্থ্যও সীমিত। কিন্তু আত্মা যেহেতু চিরস্থায়ী তাই এর শক্তিসামর্থ্যও অসীম। আর আল্লাহ্ তা'লা আত্মাকে এমনভাবে বানিয়েছেন যে, বিস্তৃত করতে থাকলে তা বিস্তৃত হতেই থাকবে এবং মানুষ যত উন্নতি করতে চাইবে, ততটাই করতে পারবে।

অতএব আধ্যাত্মিক শক্তি যেহেতু সর্বদা কাজে আসবে তাই আল্লাহ্ তা'লা একে বৃদ্ধির জন্য অগণিত-অসীম মাধ্যম রেখেছেন। আর দৈহিক শক্তি যেহেতু নিঃশেষ হয়ে যাবে, কেননা দেহের অবসান ঘটার সাথে সাথে এর শক্তিসামর্থ্যও হারিয়ে যায়; এ কারণেই এগুলো বৃদ্ধির উপায়-উপকরণও সীমিত রাখা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকুলের মাধ্যমে আমরা এর প্রমাণ দিয়ে থাকি। এটি প্রমাণিত বিষয় যে, দৈহিক সকল শক্তিই সীমিত। একটি সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ- পাকস্থলী একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত বড়ো হয়, এরপর আর প্রসারিত হয় না। একইভাবে বক্ষও একটি মাত্রা পর্যন্ত প্রশস্ত হবে। অনুরূপভাবে মাথা বড়ো হবারও একটি সীমা আছে। এমন নয় যে, বড়ো হতে হতে মটকার সমান হয়ে যাবে। অথবা মানুষের উচ্চতা ৬-৭ ফুট হয়ে থাকে কিংবা বেশির বেশি ৯ ফুট পর্যন্ত হবে কিন্তু কখনোই ২০-২৫ ফুট পর্যন্ত যেতে পারবে না। কাজেই, দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের (বৃদ্ধির) সীমা নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে যে শক্তিসামর্থ্য আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো কখনো শেষ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ- মস্তিষ্কে বিভিন্ন বিষয়ও কথা স্মরণ রাখার বিভিন্ন কোষ রয়েছে। সেগুলো যত বৃদ্ধি করবে, তা বাড়তে থাকবে। একজন যত বড়ো আলেম বা জ্ঞানীই হোক না কেন তার এই কোষ কখনো শেষ হবে না, বরং সেই শক্তি বৃদ্ধি পেতেই থাকবে কেননা, এটি

আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। দেহ এবং আত্মার যোগসূত্র হলো মস্তিষ্ক, কিন্তু পাকস্থলী ইত্যাদির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। অতএব ফেরেশতাদের অনুপ্রেরণাকে মানুষ যত বেশি কাজে লাগাবে ততই (এই) শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি কুরআন থেকে জানা যায় সেটি এক সাধারণ রীতি এবং (যা) প্রত্যেকেই বুঝবে। আর তা হলো, **كُنْدَ بِيَمِ جَنْسٍ بَاهِمٍ جَنْسٍ پَرَوَازِ** (উচ্চারণ: কুনা দ হাম জিন্স বাহাম জিন্স পারওয়ায) অর্থাৎ ‘একই প্রজাতির পাখি একসাথে ওড়ে বা চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।’ এই নিয়মের অধীনে যারা ফেরেশতার মতো হয়ে যায় তাদের জন্য ফেরেশতার কল্যাণরাজিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ তা’লা ফেরেশতার যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা হলো, **لَا يَغْضُؤْنَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ** অর্থাৎ, তারা আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে না, তাদের যে আদেশই দেওয়া হয় তারা তা-ই পালন করে (আত-তাহরীম: ৭)। কেউ যখন নিজের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে তখন ফেরেশতার সাথে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। (এমতাবস্থায়) কেউ যদি বলে, এগুলো তো বড়ো লোকদের কাজ, নিম্নমানের মানুষ কী করবে? কিন্তু এমন লোকদের জন্যও কিছু মাধ্যম রয়েছে। আমি এই মাধ্যমগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম সেটির উল্লেখ করছি যা স্বয়ং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন।

প্রথম মাধ্যম যে মাধ্যমটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উল্লেখ করেছেন তা হলো, যার প্রতি জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হন তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করলে এটি অর্জন হয়। কেননা তাঁর চোখ, হাত, নাক, মুখ সর্বোপরি তাঁর দেহের প্রতিটি বিন্দু হতে এমন জ্যোতির্ময় রশ্মি নির্গত হয় যা হৃদয়কে প্রভাবিত করে আর এভাবে পরোক্ষভাবে মানুষের ওপর ফেরেশতা অবতীর্ণ হতে থাকে। পবিত্র কুরআন থেকে এভাবে এর প্রমাণ পাওয়া যায় যেমনটি আল্লাহ তা’লা বলেন, **كُونُوا مَعَ الصَّٰرِقِينَ** অর্থাৎ, সংসঙ্গ অবলম্বন করো (আত-তওবা: ১১৯)। এর তাৎপর্য হলো, সত্যবাদীদের সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করো যেন তাদের ওপর জিবরাঈলের যে প্রভাব রয়েছে তা থেকে তোমরাও অংশ লাভ করতে পারো।

একজন অসহায়কে তুলে আনার মাধ্যম হলো এটিই, সে যেন অন্যকে আঁকড়ে ধরে (এবং) তাকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে যায়। একইভাবে জিবরাঈল (আ.) যার প্রতি অবতীর্ণ হন তাঁর সাহায্য নিয়েও এমন মানুষ দাঁড়িয়ে যায়।

দ্বিতীয় মাধ্যম হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করা। আর এটিও পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়। অতএব আল্লাহ তা’লা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿৫৭﴾ (আল-আহযাব: ৫৭)

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতারা এই নবীর ওপর সর্বদা আশিস বর্ষণ করছেন, আর তারা যখন আশিস বর্ষণ করে হে মু'মিনগণ! তোমাদেরও কাজ হলো তাঁর প্রতি আশিস ও রহমত কামনা করা।

এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমরা যদি একথা মেনেও নেই যে এ আয়াতে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা কীভাবে বোঝা গেল যে, এর ফলে ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়? এর প্রমাণ কুরআনেই পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿৮২﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ﴿৮৩﴾ هُوَ الَّذِي يُصَيِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿৮৪﴾ (আল-আহযাব: ৮২-৮৪)

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) করো। সেই খোদা এবং তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার রাশি হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন।

একস্থানে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেহেতু আল্লাহ্ এবং ফেরেশতারা এই নবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন সেহেতু তোমরাও (তাঁর প্রতি দরুদ) প্রেরণ করো। অপরস্থানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ এবং ফেরেশতারা তোমাদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন। প্রথম আয়াত অনুসারে এখানেও বলা উচিত ছিল, যেহেতু আল্লাহ্ এবং ফেরেশতারা তোমাদের প্রতি দরুদ পাঠ করেন তাই তোমরাও একে অপরের প্রতি দরুদ প্রেরণ করো, কিন্তু তা বলা হয় নি। এথেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, প্রথম কথাটি (একটি) স্থায়ী আদেশের মর্যাদা রাখত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ এবং ফেরেশতারা যেহেতু এই রসূলের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন তাই তোমরাও (দরুদ) প্রেরণ করো। আর দ্বিতীয় আয়াতে এ কাজের পুরস্কার বর্ণনা করেছে যে, তোমরা যেহেতু এই আদেশ মান্য করেছো সেহেতু এর পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ্ এবং রসূলও তোমাদের প্রতি (দরুদ) প্রেরণ করা শুরু করেছেন। সেখানে তো মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার কারণে দরুদ প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আর এখানে এর পুরস্কার বর্ণিত হয়েছে।

পুরস্কারের বিনিময়ে যেহেতু পুনরায় অন্য কোনো কাজের আদেশ দেওয়া হয় না তাই পরবর্তীতে বলা হয় নি যে, তোমরাও অন্যদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করো। উদাহরণস্বরূপ- আমরা যেমন টাকা দিয়ে কাপড় কিনলে কাপড় বিক্রেতা একথা বলতে পারে না যে, আমি যে কাপড় দিয়েছি তোমরা এর প্রতিদানে কিছু দাও নি। তেমনি প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন, যেহেতু আল্লাহ এবং ফেরেশতারা এই রসূলের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন, সেহেতু তোমরাও (তাঁর প্রতি দরুদ) প্রেরণ করো। কিন্তু মু'মিনদের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র এটুকুই বলেছেন যে, আমরা এবং ফেরেশতারা তাঁর (সা.) প্রতি দরুদ প্রেরণ করি। এর সাথে এটি বলেন নি যে, তোমরাও ভাইদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করো।

বস্তুত এই আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করলে ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অতএব যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করবে তাদের সাথে ফেরেশতাদের একটি সামঞ্জস্য গড়ে উঠবে আর এভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এ কারণেই পুণ্যবানরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করাকে অনেক উন্নত আমল বা কাজ আখ্যা দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, “সেই দোয়া যাতে খোদার প্রশংসা এবং আমার প্রতি দরুদ থাকবে না সেই দোয়া গৃহীত হবে না” (সুনান আবী দাউদ, কিতাবুস্ সালাত, বাবুদ দোয়া)। এর অর্থ হলো, যে দোয়াতে আল্লাহ তা'লার প্রশংসা এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ শামিল করা হয় সেই দোয়া বেশি গৃহীত হবে।

স্মরণ রাখা উচিত, পৃথিবীতে সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুর মাঝে পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক থেকে থাকে।

আল্লাহ তা'লা বলেন,

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَكًّا رَسُولًا ﴿٩٦﴾

(বনী ইসরাঈল: ৯৬)

অর্থাৎ, ফেরেশতারা ‘যদি ভূপৃষ্ঠে বসবাস করত, তাহলে আমরাও আকাশ হতে ফেরেশতাকেই রসূল বানিয়ে অবতীর্ণ করতাম’। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা যেন বলছেন যে, মানুষ যদি উন্নতি করতে করতে ফেরেশতা হয়ে যেত তাহলে আমরা তাদের জন্য ফেরেশতাই অবতীর্ণ করতাম। অর্থাৎ ফেরেশতাদের মতো হলেই তারা নাযিল হয়।

এখন আমাদের দেখা উচিত, মানুষ ফেরেশতাদের মতো কীভাবে হয়?

ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্য লাভের প্রথম পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তা'লার নবীগণের বাণী পৃথিবীতে পৌঁছানো। আল্লাহ তা'লা ফেরেশতাদের বলেন,

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

(আল-হিজর: ৩০)

অর্থাৎ, ‘হে ফেরেশতারা! যখন আমি মানুষ সৃষ্টি করব এবং তারা নিজেদের উৎকর্ষে পৌঁছে যায় আর আমি তার প্রতি আমার বাণী অবতীর্ণ করি, তখন তোমরা তার কাজে সব ধরনের সাহায্য করো এবং পূর্ণরূপে তার আনুগত্য করো’। অর্থাৎ, নবীর সাথে থাকা ও তাঁর মিশনের প্রচার করা ফেরেশতাদের কাজ। এখন যে ব্যক্তি নবীর সঙ্গী হবে এবং তবলীগ করবে; সে যেহেতু ফেরেশতাদের মতো কাজ করবে, তাই তাদের মতোই হয়ে যাবে আর যখন সে এমন হয়ে যাবে তখন ফেরেশতারাও তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করবে এবং তার সাথে সম্পর্ক গড়বে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি যা ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার সাথেই সম্পর্ক রাখে তা হলো, একত্ববাদের প্রচার ও প্রসার করা, কেননা খোদা তা'লা ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেন,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَكُوتُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٩﴾

(আলে ইমরান: ১৯)

[অর্থ: আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই আর ফেরেশতারাও এবং জ্ঞানীরাও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে (এই সাক্ষ্য দেয়); তিনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, যিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়- অনুবাদক]। অর্থাৎ, আল্লাহর তওহীদের সাক্ষ্য খোদাও দেন এবং ফেরেশতারাও। এথেকে বোঝা গেল, খোদার তওহীদের প্রচার করাও ফেরেশতাদের দায়িত্ব।

যারা এসব কাজ করে তারাও তাদের কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করে। আমরা এমনও দেখি যে, যারা মিছে মিছে খোদার একত্ববাদের প্রচার করে তারাও লাভবান হয়। ভারতবর্ষে রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত দিয়ানন্দের (মতাদর্শের) লোকদের যতটা উন্নতি হয়েছে ততটা অন্য হিন্দুদের হয় নি। এর কারণ হলো, অন্যদের সাথে তুলনার নিরীখে তারা খোদার একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং এর প্রচার করে। কাজেই, আল্লাহ তা'লার একত্ববাদের জন্য আত্মাভিমानी ব্যক্তি ফেরেশতাদের কাছ থেকে অনেক কল্যাণ লাভ করে থাকে।

তৃতীয় পন্থা: ফেরেশতাসদৃশ হবার তৃতীয় উপায় হলো, ক্ষমা ও মার্জনার অভ্যাস রপ্ত করা এবং কুধারণা পরিহার করার প্রেরণা মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া। এ অভ্যাস যত বেশি দৃঢ় হবে, ফেরেশতাদের প্রেরণাও ততটাই শক্তিশালী হবে। অন্যদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করা এবং মার্জনা করা ফেরেশতাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। এর কারণ কী? কারণ হলো, খোদা তা'লা বলেন,

(আল-মু'মিন: ৮) وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

অর্থাৎ, ফেরেশতারা মু'মিনদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যে ব্যক্তি নিজের মাঝে এ গুণ বৃদ্ধি করে ফেরেশতাদের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে আর মহানবী (সা.)ও এর সত্যায়ন করেন। যেমন তিনি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের জন্য দোয়া করে ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে' (মুসলিম, কিতাবু' যিকরে ওয়া'দ দুআ ওয়া'ত তাওবাতু ওয়া'ল এসতিগফার, বাব ফাযলু'দ দোয়ায়ে বিযাহরিল গায়েব)। অতএব মানুষের অপরাধ ক্ষমা করা এবং রাগ ও ক্রোধের প্রতিমূর্তি না হওয়া ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক গড়ার একটি মাধ্যম।

চতুর্থ পন্থা: ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্যের চতুর্থ পদ্ধতি হলো, মানুষ যেন (খোদার) তাসবীহ ও তাহমীদ (তথা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও গুণকীর্তন) করে। খোদা তা'লা ফেরেশতাদের যে কাজ দিয়েছেন তা হলো,

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

(আয-যুমার: ৭৬)

অর্থাৎ, তারা খোদার তাসবীহ ও হামদ করে। তাই যারা তাসবীহ ও তাহমীদ করে ফেরেশতাদের সাথে তাদেরও বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মহানবী (সা.)-এর বাণী থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি (সা.) বলেন, 'যেখানে কেউ খোদার স্মরণে রত থাকে সেখানে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়'।

এ সম্পর্কে এটিও স্মরণ রাখবে যে, আমি সাধারণত কুরআন থেকেই যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করি, আর সেই বিষয়টি হাদীসেও পাওয়া যায়। যার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় যে, মহানবী (সা.)-ও কুরআনের আলোকেই এসব কথা বলতেন। তবে তাঁর (সা.) জ্ঞান যেহেতু অত্যন্ত ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গীন ছিল, তাই তিনি (সা.) অতীত উত্তমরূপে এসব বিষয়ের (কুরআন থেকে) ব্যাখ্যা করতেন।

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ - আয়াতের আলোকে আমি বলেছিলাম, তাসবীহ করা ফেরেশতাদের কাজ আর (এখন) হাদীস থেকে জানা গেল, যারা এই কাজ করে

ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যেখানে খোদাকে স্মরণ করা হয় সেখানে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়’। (মুসলিম, কিতাবুয্ যিকরে ওয়াদ দুআ ওয়াত্ তাওবাতু ওয়াল্ এসতিগফারু; বাব ফাযলু মাজালিসিয্ যিকরি)

অর্থাৎ, সেখানে তারা নিজেদের কল্যাণ ধারা বর্ষণ করেন। কয়েক বছর পূর্বে আমি ‘যিকরে এলাহী’ বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলাম। সে সম্পর্কে একজন অআহমদী ভদ্রলোক যিনি তখনো বয়আত করেন নি, বলেন, আমি ফেরেশতাদের কল্যাণরাজির জীবন্ত সাক্ষী। সেই দিনগুলোতে আমার চোখের অসুখ ছিল আর সেদিন আমি অনেক কষ্ট করে অন্যদের সহায়তায় জলসাগাহে গিয়েছিলাম। কিন্তু বক্তৃতা শোনার পর আমার চোখ ভালো হয়ে যায় আর আমি একা ফেরত আসি।

এরপর এক ধরনের যিকর হলো, নীরব (যিকর), অর্থাৎ মানুষ নিভৃতে বসে খোদা তা’লার তাসবীহ করে। আরেক ধরনের যিকর হলো, প্রকাশ্য (যিকর) আর তা হলো, মানুষের কাছে গিয়ে শোনানো এবং তাদেরকে তবলীগ করা। এ দুটি পছন্দই এমন যা অবলম্বন করে মানুষ ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক গড়তে পারে।

পঞ্চম পদ্ধতি হলো, পবিত্র কুরআন পাঠ করা। এর মাধ্যমেও ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়। যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যেখানে কুরআন পাঠ করা হয় সেখানে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়’। (বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল্ কুরআন, বাউ নুযুলুস্ সাকীনাতে ওয়াল্ মালায়েকাতু ইনদা কিরাআতিল্ কুরআন)

অতএব এ বিষয়টি স্মরণ রেখো যে, ফেরেশতা যে কাজ করে সেই একই কাজ যখন মানুষও করবে তখন তার সাথে ফেরেশতাদের সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

ষষ্ঠ পছন্দ: যাঁর প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ হতো এমন ব্যক্তির রচিত বইপুস্তক পাঠ করলেও ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়। অতএব যে ব্যক্তি হযরত সাহেব {অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.)}-এর পুস্তকাদি পাঠ করবে তার ওপর ফেরেশতারা অবতীর্ণ হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠ করার সময় যে বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়— এটি হলো তার কারণ। যখনই পড়বে তখনই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব ও কল্যাণ ধারা অবতীর্ণ হবে। বারাহীনে আহমদীয়া বিশেষ ঐশী কল্যাণরাজির অধীনে রচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা হলো, যখনই আমি এটি পড়তে বসি দশ পৃষ্ঠাও পড়তে পারি না, কেননা এতো বেশি নতুন নতুন বিষয় ও গূঢ়তত্ত্ব উন্মোচিত হতে শুরু করে যে, মনমস্তিষ্ক তাতেই নিবিষ্ট হয়ে যায়।

অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তকও বিশেষ কল্যাণ বহন করে। এগুলো পাঠ করাও ফেরেশতাদের কাছ থেকে কল্যাণ লাভের মাধ্যম আর এগুলোর মাধ্যমে নতুন নতুন জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয়। অন্যান্য পুস্তক পড়লে যতটুকু ব্যবহৃত শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে তুমি বিষয়বস্তু ততটাই বুঝবে। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক পাঠ করলে বিষয়বস্তু অনেক বেশি সুস্পষ্ট হয় তবে শর্ত হলো, বিশেষ কিছু শর্ত মেনে পাঠ করতে হবে। পবিত্র কুরআন পাঠ করলে এর চেয়েও অধিক তত্ত্বজ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি কী কী শর্তসহ পাঠ করা উচিত যদিও তা আমার বর্ণিত এই বিষয়বস্তুর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথাপি আমি একটি শর্তের উল্লেখ করছি।

প্রথম বস্তু বের করে দেবার পরই অন্যটি প্রবেশ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ— একটি স্থানে বসে থাকা মানুষ বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য মানুষ (সেখানে) প্রবেশ করতে পারে না; এছাড়া (সম্ভব) নয়। কাজেই হযরত সাহেব { অর্থাৎ, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) }-এর কোনো পুস্তক পড়ার পূর্বে নিজের ভেতর থেকে সব ধ্যানধারণা বের করে দিতে হবে এবং নিজের মনমস্তিষ্ককে সম্পূর্ণরূপে (বিদ্রোহ) মুক্ত করে এরপর সেগুলো পাঠ করতে হবে। কেউ যদি এভাবে সেগুলো পাঠ করে তাহলে সে অনেক বেশি এবং সঠিক জ্ঞান অর্জন করবে। কিন্তু নিজের কোনো বিশ্বাস বা মতবাদদুষ্ট হয়ে সেগুলো পড়া হলে এরূপ ফল প্রকাশিত হবে না।

অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকগুলো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনমানসিকতা নিয়ে পড়া উচিত। কেউ যদি এমনটি করে তাহলে সে সুস্পষ্টভাবে অনেক বেশি কল্যাণ লাভ করবে।

সপ্তম পন্থা: ফেরেশতাদের কল্যাণ লাভের সপ্তম পদ্ধতি হলো, যে স্থানে বিশেষভাবে ফেরেশতাদের অবতরণ ঘটেছে মানুষের তা পরিদর্শন করা উচিত। ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, যে ব্যক্তির ওপর জিবরাঈল (আ.) এবং ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় তাদের সান্নিধ্যে বসলে কল্যাণ লাভ হয়। এখন আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলো, যে স্থানে ফেরেশতারা বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেখানে গেলেও (মানুষের ওপর) বিশেষভাবে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়। অতএব এই রীতি অনুসারে জুমুআর নামাযে যাওয়াও খুবই উপকারী। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘খুতবা আরম্ভ হবার পূর্বে যারা মসজিদে যায় ফেরেশতারা তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে। আর খুতবা শুরু হয়ে গেলে (তারা) আর লেখে না’ (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৯)। কাজেই, নিয়মিত জুমুআর নামাযে গেলে এবং বার

বার যাবার ফলে ফেরেশতাদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয় আর তাদের মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া যায়।

অষ্টম পন্থা: ফেরেশতাদের মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হবার অষ্টম পদ্ধতি হলো, (যুগ) খলীফার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। এটিও পবিত্র কুরআন থেকে সাব্যস্ত। যেমনটি বলা হয়েছে,

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ
(আল-বাকারা: ২৪৯)

অর্থাৎ, এক যুগে একজন নবীকে লোকেরা বলল, আমাদের জন্য আপনার এমন স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করুন যার কাছ থেকে আমরা পার্থিব বিষয়াদিতে সাহায্য নেব। কিন্তু তাদের জন্য এক ব্যক্তিকে যখন স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হলো তখন তারা বলল, তার মাঝে বিশেষ এমন কী আছে যা আমাদের মাঝে নেই? (যেমনটি এখন লাহোরীরা বলে থাকে)। (তখন) নবী বললেন, এসো! তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, তার মাঝে বিশেষ কী গুণ রয়েছে যা তোমাদের মাঝে নেই আর তা হলো, যারা তার সাথে সম্পর্ক রাখবে ফেরেশতারা তাদের প্রশান্তি দান করবে। এথেকে বোঝা যায়, খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ততাও ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। কেননা বলা হয়েছে, তাদের হৃদয় ফেরেশতারা বহন করবে। তাবূত অর্থ হৃদয় এবং বন্ধ। (আল্লাহ তা'লা) বলেছেন, খেলাফতের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ লোকদের চিহ্ন হলো, তারা প্রশান্তি লাভ করবে আর পূর্ববর্তী পুণ্যবান ও নবীদের জ্ঞান তাদের ওপর ফেরেশতারা অবতীর্ণ করবে। অতএব খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়।

একটি প্রশ্ন করা হয়েছে আর তা হলো, রসূলের সাথে যদি সর্বদাই জিবরাঈল (আ.) থাকেন তাহলে কেন তিনি কোনো ভুল করেন? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উত্তর দিয়েছেন আর তা হলো, অনেক সময় পরিকল্পিতভাবে নবীর চোখ বন্ধ রাখা হয় আর এতে বড়ো বড়ো প্রজ্ঞা নিহিত থাকে।

এগুলো সেসব পন্থা যার মাধ্যমে ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। এছাড়া এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে যার কারণে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন— সেসব বিষয় যা ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর পরিপন্থি। এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে বাহ্যিক পবিত্রতারও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন— মহানবী (সা.) বলেছেন, কোনো মানুষ যদি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে আর শয়তান তাকে বিরক্ত করে তাহলে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে। পুনরায় তিনি

(সা.) বলেছেন, মানুষ যে-সব বিষয় ঘৃণা করে ফেরেশতারাও সেগুলোকে ঘৃণা করে। আরো বলেছেন, কুকুরের সাথে খেলাধুলা করাও ফেরেশতাদের (সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে) প্রতিবন্ধকতার কারণ হয় (সুনান আবী দাউদ, কিতাবুত তাহারাহ্, বাবুল জুনুবে ইউআখ্খারুল গুসলে)। এছাড়া ছবি সম্পর্কে বলেছেন, যারা নিজেদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের ছবি টাঙিয়ে রাখে তাদের বাড়িতেও ফেরেশতারা প্রবেশ করে না (মুআত্তা ইমাম মালেক, পৃ. ৭২৬)। এরপর দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খাওয়া যেমন- পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়া অথবা খাবার খাওয়ার পর মুখ পরিষ্কার না করা এবং খাবারের কণাগুলো মুখের মধ্যে পচে যাওয়া; এ ধরনের নোংরামিতে জড়িত লোকের সাথেও ফেরেশতারা সম্পর্ক রাখে না। হুক্কা সেবনকারীরা বা ধূমপায়ীরাও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ধূমপায়ী বা হুক্কা সেবনকারীদের প্রতিও সঠিক এলহাম হওয়া অসম্ভব।

পরিশেষে আমার দোয়া হলো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করুন এবং যে উদ্দেশ্যে আমরা দণ্ডায়মান হয়েছি তাতে সফলতা দিন। তাঁর পক্ষ থেকে যে শিক্ষা এসেছে সেটিকে নিজের হৃদয়ে ধারণ এবং অন্যদের কাছে পৌঁছানোর সামর্থ্য দান করুন। আমাদের সকল দোষত্রুটি ও দুর্বলতা ক্ষমা করুন। আমাদেরকে পুণ্য ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন। সকল ক্ষেত্রেই আমাদের বিজয় দান করুন। সকল স্থানে এবং সকল ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য ও সমর্থন করুন। এছাড়া সকল স্থানে আমাদের শত্রুদের লাঞ্চিত ও ব্যর্থ করুন আর আমাদেরকে ধমসংক্রান্ত ও জাগতিক বিপদাবলি থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

Malaikatullah

(The Angels of Allah)

“What are angels?”, The Promised Messiah(as) offers a simple, yet comprehensive answer to this tough question. He writes:

“[Angels] are wholly like the limbs of the Divine. All the designs of God Almighty are first reflected in their transparent mirrors. Through their mediation, the designs of God Almighty are implemented and spread throughout the whole of creation.”
(Aina-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khazain, Vol. 5, pp. 169-170, footnote)

As the Promised Messiah(as) has theoretically explained the existence of angels, Hazrat Musleh-e-Maud(ra) has practically pinpointed exactly how the Quran defines angels.

In his own words, here are Hazrat Musleh-e-Maud's(ra) 14 Quranic points on the reality of angels *(taken from his speech entitled, Malaikatullah, delivered in December 1920 at Jalsa Salana Qadian)*.

1. They are God's creation.
2. They cannot be seen by the naked eye.
3. They have no gender.
4. They are of three ranks.
5. They are unable to commit sin.
6. They fulfill Allah's command to its fullest extent.
7. No external force can manipulate them.
8. They are countless in number.
9. They follow a system of administrative order.
10. They are limited in their state and strength.
11. They have free will, but to an extremely limited extent.
12. They do not have knowledge of the unseen.
13. There are different angels allocated to different tasks.
14. They are manifestations of Divine Attributes.

© *Islam International Publications Ltd.*

ISBN 9 789849 91156-2

